MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড

www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
রেজি. নং ডিএ ১৩২৬ : ২০তম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা
নভেম্বর ২০২২
দাম : দশ টাকা

শোষণ ও দুঃশাসন হটাতে চাই-পুঁজিবাদের অবসান

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং নির্বাচন প্রথা পদ্ধতি ধ্বংস করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার গত ১৩-১৪ বছর প্রসাশন ও পুলিশের সহায়তায় গদি রক্ষার বেষ্টনী ক্রমাগত আঁটসাঁট মজবুত করতে চেয়েছে, কিন্তু দুর্নীতি ও দুঃশাসনের ফলে জনমনে গড়ে উঠা বিক্ষোভ এখন বিস্ফোরণের পরিস্থিতি তৈরি করেছে। গণতান্ত্রিক বা গণচেতনা বিকাশের স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ থাকায় বিরোধিতা এখন প্রায় গণউন্মাদনার চেহারা নিয়েছে। ক্ষমতাসীনগোষ্ঠী তাদের সম্পদ রক্ষা আর জীবন বাঁচানোর নিশ্চিত ব্যবস্থা এতোদিন যেভাবে সুরক্ষিত রেখেছিল নানা ধরনের কেলেঙ্কারি ও দুর্বৃত্তপনায় এখন তা হুমকিতে পড়েছে। সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র, পুলিশ প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা, সাংবিধানিক, স্বায়ত্তশাসিত, আধাস্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, বিনা ভোটে কিংবা নিশি ভোটে জয়ী দলসহ প্রায় ষাট হাজারের বেশি কথিত স্থানীয় সরকারের জনবর্জিত জনপ্রতিনিধি, নির্বাচন কমিশন, রাতারাতি বিত্তবৈভবের মালিক বনে যাওয়া কথিত উদ্যোক্তাগোষ্ঠী, ব্যাংক ফাঁকা করে দেয়া ঋণখেলাপি, ঋণঅবলোপনকারী, বিদেশে টাকা পাচারকারী ইত্যাদি মিলে যে কঠিন রাষ্ট্রীয় জগদ্দল পাথর জনগণের মাথায় চাপানো ছিল, তাতে চিড় ধরা শুরু হয়েছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে জনজীবনে নাভিশ্বাস উঠেছে বহু আগেই। ঢাকা শহরে ৪ জনের পরিবারে মাছ-মাংস ছাড়া খাওয়া খরচ মাসে ৯ হাজার ৫৯ টাকা আর মাছ-মাংস খেলে মাসে ২২ হাজার ৪২৯ টাকা লাগে বলে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষা খাতে খরচের ৭১% আর চিকিৎসা খাতে ৭৫% ব্যয় বহন করতে হয় পরিবারগুলোকে।

প্রতিবছর শ্রম বাজারে ২০ লাখ চাকরি প্রত্যাশী এলেও নতুন চাকরি নেই বললেই চলে বরং ছাঁটাই চলছে। পরাধীন পাকিস্তান আমলে অগ্রহণযোগ্য হলেও ন্যূনতম মজুরির বিধান ছিল কিন্তু এখনও স্বাধীন বাংলাদেশে এই বিধান চালু হয় নাই। পাকিস্তানি ২২ পরিবার কারখানা তৈরি করেছে, কারখানা সংলগ্ন ভালো বসবাসের অনুপযুক্ত হলেও শ্রমিকদের জন্য কলোনি ছিল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বিদ্যালয়, খেলাধূলার মাঠ ছিল। স্বাধীন দেশের দেশপ্রেমিক শিল্পপতিরা ভালো আলো বাতাস খেলা বাসাবাড়ি, উপযুক্ত শিক্ষক, ক্লাশরুমসহ বিদ্যালয়, ডাক্তার নার্সসহ প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র দূরে থাক—পরাধীন আমলে শ্রমিকদের যা প্রাপ্য ছিল তা দেয়ার দায় থেকে মুক্ত থাকছেন ৫২ বছর ধরে। অথচ এরাই স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করেছেন মহাসমারোহে। এ যেন লুটপাটের স্বাধীনতা। উপায়হীন বেকার মানুষেরা যখন পেটের দায়ে রাস্তার পাশে ফুটপাতে দোকান পাতে সেখানেও চলে ব্যাপক জবরদস্তির চাঁদাবাজি। ঢাকা শহরে প্রায় ৩ লাখের উপর হকার বসে, সেখানেও শাসক দলের পেটোয়াদের পুলিশি পাহারায় হামলা চলছে। প্রতিদিন শাসক দলের ২২ জন ৬ কোটি টাকা ফুটপাতের হকারদের কাছ থেকে তোলা তোলে। এই হিসেবে মাসে ১৮০ কোটি টাকার চাঁদাবাজি হয়। পত্রিকার খবর অনুযায়ী এই টাকার ভাগ নিচ থেকে অনেক উপর পর্যন্ত নানা স্তরে যায়, *প্রথম আলো*-২৯ অক্টোবর '২২।

বাসদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ১২ নভেম্বর '২২ ঢাকার শাহবাগে অনুষ্ঠিত সমাবেশে জমায়েতের একাংশ বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ

কারাগারের নাম হয়েছে এখন সংশোধনাগার

নানা অপরাধে, বিনা বিচারে, মিথ্যা মামলায় জেলখানায় আছে এখন ৮৩ হাজার কারাবন্দি। এত কারাবন্দির জন্য চিকিৎসক আছে মাত্র ৪ জন। যদিও হোমরাচোমরা ক্ষমতাধররা থাকেন হাসপাতালের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে। ৬৮ কারাগারে ১৪১ চিকিৎসক পদের মধ্যে ১৩৭টিই খালি। শুধু রাষ্ট্রীয় কারাগার নয় সারাদেশই যেন আজ কারাগারে পরিণত হয়েছে। যাদের শ্রমে শহর চলে তাদের আজ বস্তি ছাড়া থাকার উপায় নেই। প্রায় ১০ লাখ বস্তিবাসী দখলদার-তোলাবাজদের কাছে জিম্মি। ঢাকা মহানগরে ১৯৯০-এর দশকে ৯৩ একর জমির উপর একটি বস্তি যার নাম কড়াইল বস্তি। এখানে ৪০ হাজার ঘর, ছোট বড় ১০ হাজার দোকান আছে। এদের মধ্যে ৫ হাজার ব্যক্তি মালিক যারা ভাড়া দিয়ে টাকা তোলে। এই বস্তিতে দিনমজুর, পোশাকশ্রমিক, রিকশা চালক, গৃহশ্রমিকসহ নিম্ন

এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

কর্নেল তাহের : সমাজ বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর এক লড়াকু জীবন

[২১ জুলাই '২২ কর্নেল তাহেরের ৪৬তম ফাঁসি দিবস উপলক্ষে বাসদ কুমিল্লা জেলা শাখার উদ্যোগে ২৮ জুলাই কুমিল্লা টাউন হলে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা কমরেড খালেকুজ্জামান। তাঁর বক্তব্য কিছুটা সম্পাদনা করে ভ্যানগার্ডে ছাপা হলো।- সম্পাদক]

মাত্র ৩৮ বছরের জীবন কর্নেল তাহেরের। আর এই স্বল্প সময়ের জীবন যেন সংগ্রামের এক মহাকাব্য। এই মহাকাব্যিক জীবনের কয়েকটা বিষয় শুধু আজকের আলোচনায় তুলে ধরার চেষ্টা করবো। আপনারা জানেন যে, কর্নেল আবু তাহের একটা সমাজ বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতেন আর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে লড়াকু পথে চলতে চলতেই তিনি ফাঁসিকাষ্ঠে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। তাঁর এই গোটা জীবনজুড়ে গড়ে গেছেন সফলতা-ব্যর্থতা, ভুল-শুদ্ধমিলে অসংখ্য সংগ্রামের কীর্তি, যা আগামী দিনের বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা হয়ে আছে এবং থাকবে।

কৈশোর থেকেই সমাজ বদলের ভাবনায় বিভোর ছিলেন তাহের

এই বিপ্লবী চিন্তা তাঁর মধ্যে গড়ে উঠল কীভাবে? তারও একটা ইতিহাস আছে। পরাধীন দেশে সমাজের চারিদিকে অনাচার, অবিচার, শোষণ চলছে, তাঁর মধ্যে একটা যৌক্তিক প্রতিবাদী শক্তি তৈরি করা, একদিকে পরাধীনতার গ্লানি দূর করে এই শোষণমূলক ব্যবস্থা থেকে কী করে সমাজকে মুক্ত করা যায়, এই চিন্তা থেকেই তাঁর মধ্যে একটা সমাজ ভাবনা তৈরি হয়েছিলো। বড় বোন ছিলেন ময়মনসিংহ শহরের মোমিনুন্নেছা কলেজের ছাত্র সংসদের ভিপি। করতেন বামপন্থি রাজনীতি। সেখান থেকেই বামপন্থি রাজনীতি সম্পর্কে ধারণা পান তিনি। তখন তিনি মাধ্যমিক স্তরে লেখাপড়া করতেন। তারপর থেকেই তার ভাবনা আরও

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

রিজার্ভ সংকট এবং আইএমএফের ঋণ

রিজার্ভ নিয়ে সাফল্য প্রচারের সাথে সাথেই যেন আতঙ্ক গ্রাস করেছে। যেহেতু খাদ্য, সার, জ্বালানি, মেশিনপত্র, গাড়ি ইত্যাদি আমদানি করতে হয় এবং দেশি-বিদেশি ঋণ ও সুদ শোধ করতে হয় তাই রিজার্ভ কমছে প্রতি মাসে। সম্ভাব্য সংকটের আশঙ্কায় আইএমএফের কাছে গত জুলাইয়ে ৪৫০ কোটি ডলার বা ৪৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ চেয়েছে বাংলাদেশ। ঋণ নিয়ে আলোচনা করতেই সংস্থাটির প্রতিনিধি দল এসেছে ঢাকায়। সংস্থাটির এশীয় ও প্যাসিফিক বিভাগের প্রধান রাহুল আনন্দের নেতৃত্বাধীন একটি দল গত ২৬ অক্টোবর থেকে ৯ নভেম্বর পর্যন্ত সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে এবং তিনটি বেসরকারি সংস্থার সাথে বৈঠক করছে। তারই ধারাবাহিকতায় সচিবালয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সঙ্গে সোমবার তিনটি আলাদা বৈঠক করেছে আইএমএফের দল। সেসব বৈঠকে ভর্তুকি কমানোসহ আইএমএফের নানা ধরনের শর্ত ও আলোচনার কথা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে।

আইএমএফের সফররত দলটি সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বরাদ্দ থেকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের প্রকৃত খরচের প্রবণতা জানতে চেয়েছে। তারা আরও জানতে চেয়েছে জ্বালানি তেলসহ বিদ্যুৎ, সার ও গ্যাসে দেওয়া ভর্তুকি ও লোকসানি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে বেসরকারি খাতে ছেড়ে

এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

আইএমএফ-এর কাছ থেকে শর্তযুক্ত ঋণ নেওয়ার প্রতিবাদে বাম গণতান্ত্রিক জোটের উদ্যোগে ৮ নভেম্বর ঢাকার পুরানা পল্টনে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

কর্নেল তাহের : সমাজ বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর এক লড়াকু জীবন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অগ্রসর হয়। তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এমএ ক্লাসের প্রথম পর্বে পড়ছেন, তখন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান—এই ধরণের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হলে নির্বিঘ্ন একটা আরাম আয়েশের জীবনযাপন করা যাবে এটা ঠিক কিন্তু প্রশ্ন হলো এই সমাজের যে আধোগতি, আমি কি এর মধ্যে বাস করবো নাকি এটাকে পাল্টাবো? সেখান থেকে তিনি ভাবলেন যে, এটা পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু পরিবর্তন তো আমি চাইলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে হবে না। ইতিহাসের কিছু শিক্ষা, বিশেষ করে ব্রিটিশ ভারতে উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামসহ দুনিয়ার দেশে দেশে বিপ্লবী আন্দোলন, জনগণের সংগ্রামের ইতিহাস, সেগুলো থেকে শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা তিনি করেছেন।

নিজের এবং দেশের মর্যাদা রক্ষায়ই যোগ দেন সেনাবাহিনীতে

একটা শোষণের ব্যবস্থা যখন কায়েম হয়ে যায়, শোষক শ্রেণি এর থেকে লাভবান হয়। একটা কায়েমী স্বার্থ তৈরি হয়। এরা স্বেচ্ছায় একে ছেড়ে দেবে না। এদেরকে রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থা থেকে, ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে। কিন্তু কীভাবে? তখন তিনি চিন্তা করলেন যে, আজ হোক কাল হোক, একটা সময় জনগণকে সাথে নিয়ে একটা যুদ্ধে আমাদের নামতে হবে। এই ধরণের ইতিহাস (দেশে দেশে বিপ্লবের ইতিহাস) থেকে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং ভাবলেন, যদি কোনদিন এ ধরণের যুদ্ধে নামতে হয়, তাহলে তার জন্য প্রশিক্ষণ লাগবে। তাই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ালেখা শেষ না করে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিলেন। সামরিক বাহিনীতে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি যে একটা বড় অফিসার হবেন, আরাম আয়েশের জীবনযাপন করবেন এমন চিন্তা তাঁর ছিলো না। নজরুলের গানে আছে–'এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবো রে বিকল'। এমন একটা ভাবনা থেকে তিনি সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। যদি তা না হতো, তাহলে '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে ভারতে এসে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন না। তাহলে এখান থেকে আপনারা বুঝতে পারছেন, যে প্রচলিত উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিরাপদ আরাম আয়েশের জীবন বা সামরিক বাহিনীতেও পদ পদবি লাভ করে নিশ্চিত জীবনযাপন করতে পারতেন তিনি। কিন্তু তাঁর জীবনে প্রতিমুহূর্তেই এর উল্টো ছবি আমরা দেখতে পাই।

সামরিক বাহিনীতে যোগ দেয়ার ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে, সে সময়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে মনে করা হতো বাঙালিরা যুদ্ধের জন্য বা সামরিক কাজের জন্য সক্ষম নয়। গোটা সশস্ত্র বাহিনীতে পশ্চিম পাকিস্তানি পাঞ্জাবিদের সংখ্যা ছিল ৮০ ভাগ আর বাঙালিদের সংখ্যা ছিল মাত্র ২ ভাগ। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে মাত্র ২টি ব্যাটালিয়ন ছিল। তখন পাঞ্জাব ও বেলুচ রেজিমেন্টে ৩০টি করে ব্যাটালিয়ন এবং ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্টে ২০টি ব্যাটালিয়ন ছিল। বাঙালিদের দুটি রেজিমেন্টেও শতকরা ৫০ ভাগ পাঞ্জাবি সেনা সদস্য ছিল। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, শিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রের পাশাপাশি পূর্ব-পশ্চিমের এই বৈষম্যমূলক অবস্থা কর্নেল তাহেরকে জাতিগত অধীনতা বুঝতে সহায়তা করেছিল। একই সঙ্গে শারীরিক সক্ষমতা এবং দক্ষতার নজির রেখে তিনি প্রমাণ করেছেন বাঙালিরা দুর্বল জাতি নয়। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে তিনি অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধকে ব্যবস্থা বদলের গেরিলা জনযুদ্ধে পরিণত করতে চেয়েছিলেন

কর্নেল তাহের পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসার পর যুদ্ধের একটা সেক্টরের দায়িত্ব দেওয়া হলে তিনি আরো কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তা ও সেক্টর কমান্ডারদের সঙ্গে আলোচনা করে বললেন, 'পাকিস্তান আর্মির মতো একটা অ্যাডভান্সড আর্মির সঙ্গে গেরিলা ওয়ার ফেয়ার ছাড়া আর কোনভাবে আমরা পারবো না। আমি হিসাব করে দেখেছি সাত আট মাসের মধ্যে কৃষক, ছাত্রদের নিয়ে প্রায় ২০ ডিভিশনের একটা বিরাট গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলা যায়। এতে করে ভারতীয় আর্মির ওপর আমাদের নির্ভরতাও কমবে। আমি এটাও স্ট্রংলি ফিল করি যে, আমাদের সেক্টর কমাণ্ডারদের হেডকোয়ার্টারগুলো ইন্ডিয়ার মাটি থেকে সরিয়ে যতটা সম্ভব বাংলাদেশের ভেতরে নিয়ে যাওয়া দরকার। ফাইনালি আই অলসো ফিল দ্যাট উই স্যুড হ্যাভ মোর কন্টাক্ট উইথ দি স্পন্টেনিয়স ওয়ার লর্ডস' (ক্রাচের কর্নেল, শাহাদুজ্জামান, পৃ. ১১৮)। ভারতের মাটিতে বসে আমরা যুদ্ধ করতে চাই না। এই যুদ্ধটা হওয়া উচিত দেশের ভিতর থেকে। প্রথমদিকে অনেকে এই কথার পক্ষে সায় দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন ওসমানী সাহেবের কাছে গিয়ে কথাটা পেশ করার প্রস্তাব এলো, তখন তারা থাকলেন না। জেনারেল ওসমানী সাহেব এটা অনুমোদন করতে পারলেন না এবং ভারতীয় বাহিনীরও একটা নেতিবাচক মনোভাব ছিল। কর্নেল তাহেরের প্রস্তাব অনেকটা এরকম ছিল যে, ভারত যদি আমাদের সাহায্যই করতে চায়, তাহলে আমাদের যেসব সামরিক বাহিনী, পুলিশ এবং বিডিআরের লোকেরা ছিল তাদেরকে দিয়ে দেশের ভেতরে প্রথমে ভৌগলিক-সামরিক গুরুত্ব বিবেচনায় এক দুইটা সেক্টর খুলে প্রাথমিকভাবে ভারতীয় বাহিনীর ব্যাক-আপ দিলেই চলত। এবং এক পর্যায়ে আর না থাকলেও সমস্যা হতো না। কুষ্টিয়া জেলার বৈদ্যনাথ তলায় স্বাধীনতার ঘোষণা হয়েছিলো কিন্তু তারপর স্বাধীনতা আন্দোলনের কেন্দ্র ভারতের ভেতর নিয়ে নেওয়া হলো। কর্নেল তাহের তাঁর যুক্তিতে বলেছিলেন, আমরা এই সামরিক বাহিনীতে কাজ করেছি, আমরা এদের চিনি। ওরা যেমন আমাদের জানে, আমরাও ওদের জানি। দেশের ভেতরে থেকে যুদ্ধ করা গেলে আপামর সাধারণ কৃষক খেটেখাওয়া মানুষকে এই যুদ্ধে যুক্ত করা যেত। আদতে সেটি পরিণত হতো একটি সশস্ত্র গণবাহিনীর জনযুদ্ধে। কিন্তু সে সময়ে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী শক্তি সেটি চায়নি।

গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন কৃষক-শ্রমিকের বিপ্লবী গেরিলা বাহিনী

১৯৬৫ সালে যখন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে কর্নেল তাহের বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন এবং 'মেরুন প্যারাসুট উইং' পুরষ্কার পেয়েছিলেন। তিনি তখন বলেছেন, বাংলাদেশের জনগণ সামরিকভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কি প্রাপ্ত না, এটা বড় কথা না। এই জনগণ যদি তাদের পাশে আমাদের দেখে এবং উৎসাহী তরুণ যুবক, যারা প্রকাশ্যে লড়াই করতে চায়, তাদের যদি আমরা প্রশিক্ষিত করি, জনগণ এই যুদ্ধের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হবে। কিন্তু এটা ভারত চায়নি। তিনি তাঁর কথায় ভিয়েতনাম আর কোরিয়া যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যদি আমরা বাংলাদেশের ভিতরে সেক্টরগুলো নিয়ে যাই, তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যাবে, হাজার হাজার কৃষক, কৃষাণী নানা মাত্রায় যোগ দিয়েছে। শ্রমজীবী জনগণ শামিল হচ্ছে। তারমানে লক্ষ কৃষকের বাহিনী তৈরি হয়ে যাবে। শহরে শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের গেরিলা ইউনিট গড়ে উঠতে থাকবে। বিষয়টি লক্ষ্য করুন। তাহলে নিরস্ত্র জনগণ সশস্ত্র একটা হানাদার বাহিনীর হাতে শুধু জীবন দিচ্ছে না, ওরা লড়ছে। সম্মুখ সশস্ত্র প্রতিরোধ সেভাবে করতে পারছে না, কিন্তু গেরিলা প্রতিরোধের শক্তি গড়ে উঠছে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত গ্রামে-গঞ্জে, সর্বস্তরে। কিন্তু আওয়ামী লীগ এবং ভারতীয়রা ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। তারা ভেবেছিল, লক্ষ লক্ষ কৃষক যদি মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ওঠে, তাদের হাতে অস্ত্র যায় এবং তারা যদি লড়াইয়ে নামে, তাহলে দেশ একদিন স্বাধীন হবে। কিন্তু ভারতীয়দের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ রাখা, সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য পূরণ বা প্রবাসী সরকারের পক্ষে স্বাধীন দেশে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হবে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা বামপন্থিদের হাতে চলে যেতে পারে। আওয়ামী লীগ নেতাদের একাংশ ভারতেই যুদ্ধের মতো বিপদে তাদের ফেলার জন্য ছাত্র-যুবকদের গালমন্দও করেছেন। আর কতদিনে দেশ স্বাধীন হবে, ভারতে কতকাল থাকতে হবে, দেশের সহায় সম্পদের কী হবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অনেকেই শঙ্কিত ছিলেন। অন্যদিকে দেশের ভেতরে থেকে যুদ্ধের জন্য প্রাথমিকভাবে ভারতের যতটুকু সহযোগিতা লাগে তা নিয়ে সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় ঘাঁটি ও সারা দেশে গেরিলা তৎপরতা চালানো শেষ পর্যন্ত অনুমোদিত হল না। এইভাবে তাহের-জলিল, জিয়াউদ্দিনদের রণকৌশল বাস্তবায়ন করা যায়নি।

১১ নং সেক্টর হয়ে উঠল প্রতিরোধের অনন্য দুর্গ

কর্নেল তাহের, মেজর জলিলসহ অনেক সাবেক সামরিক বাহিনীর অফিসার ও সৈনিকেরা বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকে কয়েকটা লড়াই পরিচালনা করলেন। পরিকল্পনামতো নিজের সেক্টরটিকে সাজাতে শুরু করেন তাহের। প্রথমত, সেক্টরের হেডকোয়ার্টারটিকে তিনি নিয়ে যান যতটা সম্ভব সীমান্তের কাছে। তাহের তাঁর হেডকোয়ার্টার বসান পাকিস্তানিদের কামালপুর ঘাটির মাত্র ৮০০ গজের মধ্যে। মাঝখানে শুধু কয়েকটি ট্রেঞ্চ। শত্রু ঘাটির এত কাছে অন্য আর কোন সেক্টরের হেডকোয়ার্টার তখন নেই। তাঁর সেক্টরের যুদ্ধকে তিনি পরিণত করতে চান একটি জনযুদ্ধে। নিয়মিত বাহিনীর উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে যত দ্রুত সম্ভব আরও বেশি সংখ্যক সাধারণ মানুষদের তিনি যোদ্ধায় পরিণত করতে চান। এমনকি নিয়মিত বাহিনীর ভেতরেও সেপাই আর অফিসারদের মধ্যে দূরত্ব ঘুচিয়ে ফেলতে চান তিনি। স্বাধীনতার এই যুদ্ধকে তিনি ক্রমশ ধাবিত করতে চান সমাজতন্ত্রের জন্য যুদ্ধে। সেজন্য এই যুদ্ধের একটা রাজনৈতিক মাত্রা যোগ করাও খুব জরুরি মনে করেন তিনি। মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'আমি খোঁজ পেয়েছি কোনো কোনো মুক্তিযোদ্ধা কৃষকদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে তার খাসি আর মুরগি খেয়ে চলে আসে। মনে রাখবে এভাবে গেরিলা যুদ্ধ হয় না। কৃষকের কাছে যে সহযোগিতা তুমি পাবে তার প্রতিদান দেবার চেষ্টা করবে। যদি কোন কৃষকের গোয়ালে রাত কাটাও তাহলে সকালে গোবরটা পরিষ্কার করে দিও। যেদিন অপারেশন থাকবে না সেদিন তোমার আশ্রয়দাতাকে একটা ডিপ ল্যাট্রিন তৈরি করে দাও, তাদের সঙ্গে ধান কাটো, ক্ষেত নিড়াও। এভাবেই তুমি তাদের আস্থা অর্জন করতে পারবে'। (ক্রাচের কর্নেল, শাহাদুজ্জামান, পৃ. ১২১) যোদ্ধাদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে গড়ে তোলার জন্য তাঁর সেক্টরের সব কোম্পানি এবং প্লাটুনগুলোতে বেছে বেছে রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছেলেদেরকে পলিটিক্যাল কমিশার হিসেবে নিয়োগ দেবার চেষ্টা করতে থাকেন। মূলত, বামপন্থি ও বিপ্লবী রাজনীতির সাথে যুক্ত ছেলেদেরকেই তিনি একাজে নিয়োজিত করেছিলেন। প্রতিটি প্লাটুনে রাজনৈতিক ক্লাসের ব্যবস্থা করেন তিনি। এভাবেই তাঁর সেক্টর স্বতন্ত্র ধারায় এগিয়ে যেতে থাকে।

যুদ্ধে আহত হয়েও লড়াকু মনোভাব হারাননি এক মুহূর্তের জন্যও

কামালপুরের সম্মুখ সমরে শেলের আঘাতে আহত হলেন। শেলবিদ্ধ হয়ে স্ট্রেচারে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে সাথে থাকা এক সাংবাদিকের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'জার্নালিস্ট আমি বলিনি ওরা কখনো আমার মাথায় আঘাত করতে পারবে না। এই দেখো পায়ে লাগিয়েছে। মাই হেড ইজ স্টিল হাই, গো ফাইট দি এনিমি, অকুপাই কামালপুর বিওপি'। আহত রক্তাক্ত অবস্থায় ভাই বেলালকে বলেন, ওয়াকিটকিটা আমার মুখের সামনে ধরো। বেলাল ওয়াকিটকিটা মুখের সামনে ধরলে রক্তাক্ত শায়িত তাহের মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে বলতে থাকেন—'আমার কিছুই হয়নি, তোমরা ফ্রন্টে ফিরে যাও, যুদ্ধ চালিয়ে যাও... কামালপুর মুক্ত করতে হবে মনে রেখো। আমি মরব না, খুব দ্রুত চলে আসব তোমাদের কাছে। পাকিস্তানিদেরকে তোমাদের হারাতেই হবে। আমি যেন ফিরে এসে দেখি কামালপুর দখল হয়েছে আর ঢাকার রাস্তা পরিষ্কার'। (ক্রাচের কর্নেল; শাহাদুজ্জামান, পৃ. ১৫৩)

ভাই-বোনদের যুক্ত করে গড়ে তুললেন ব্রাদার্স প্লাটুন

কর্নেল তাহেরের চরিত্রে অনেকগুলো দিক আছে। তার পুরো পরিবারকে তিনি মুক্তিযুদ্ধে নিয়োজিত করেছিলেন। এগারো ভাইবোনের মধ্যে আটজন সরাসরি যুদ্ধ করেছেন এবং তাদের মধ্যে চারজন খেতাবপ্রাপ্ত। কর্নেল তাহের বীর উত্তম, আবু ইউসুফ খান বীর বিক্রম। বেলাল এবং বাহারও বীর প্রতীক। বাকিরাও তাদের সাথে যুদ্ধে থেকেছেন। নিজের বোন ডলিকেও ক্যাম্পে নিয়ে এসেছিলেন, অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং অপারেশনে পাঠিয়েছেন। সে কারণে এই এগারো নম্বর সেক্টরকে বলা হতো ব্রাদার্স প্লাটুন। তাহলে খেয়াল করেন, তাঁর কিশোর বয়স থেকে বেড়ে ওঠা এবং শিক্ষাজীবনে বা তারুণ্যের সময়ে এসে তাঁর পুরো জীবনের গতি পরিবর্তন করা, সমাজ ভাবনার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা এবং ধীরে ধীরে বিপ্লবী চিন্তাভাবনার সাথে পরিচিত হয়ে সেটাকে জীবনের সঙ্গে একাত্ম করে নেওয়া এবং সেভাবে গোটা পরিবারকে যুক্ত করে লড়াইয়ে নামা সবই একসূত্রে গাঁথা।

স্থানীয় জনসাধারণ, কৃষক-কৃষাণি হতে পারত গেরিলাদের আদর্শ শিক্ষক

স্বাধীনতা যুদ্ধের একটা পর্যায়ে ভারতীয় বাহিনী যখন শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে নামলো, সেই বিষয়ে কিছু কথা সময় থাকলে বলবো। তাহের এ বিষয়ে কী বলেছিলেন? বিশেষ করে সিনিয়র মুক্তিযোদ্ধাদের মিটিং-এ তিনি বলেছেন, তোমরা কৃষকদের মধ্যে থেকে তাদের সাথে নিয়ে যদি লড়াইটা করো, তাহলে ভারতীয় জেনারেলদের চেয়ে অনেক ভালো পরামর্শ এবং লড়াইয়ের কলাকৌশল এই মানুষেরা তোমাদের শিখিয়ে দিতে পারে। উদাহরণ কী? ভিয়েতনাম। ভিয়েতনামের বাহিনী পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী বাহিনী আমেরিকান সৈন্যদের সাথে লড়েছিলো। সেই আমেরিকান বাহিনী ভিয়েতনামকে নাপাম বোমা মেরে তছনছ করে দিয়েছিলো। কিন্তু ভিয়েতনামের জনগণের বাহিনী ভিয়েত কং'রা এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং দুর্ধর্ষ যে বাহিনী, মার্কিন সামরিক বাহিনীকে মোকাবিলা করতে গিয়ে যেসব কলাকৌশল ব্যবহার করেছিলো তাতে জনগণের উদ্ভাবন ও অংশগ্রহণ ছিল যা আপনারা এখন বিভিন্ন ডকুমেন্টারিতে বা ফিল্ম আকারে দেখতে পান। বুবি ট্র্যাপে—কীভাবে কৃষকরা চাষাবাদ করছে আবার জমির নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে অনেক দূরে একটা মুখ খোলা রাখছে। ওখানে গিয়ে তারা—একদিকে জমিচাষ করছে আবার অন্যদিকে রাইফেল কাঁধে প্র্যাকটিস করছে। আমেরিকানরা তো দূর থেকে দেখে ধেয়ে আসে, কৃষক গেরিলারা গর্তের মধ্যে ঢুকে যায়, আমেরিকানরা ওদের খুঁজতে আসে আর ওরা সুড়ঙ্গ দিয়ে চলে আসে দুইশ ফিট পাঁচশ ফিট দূরে। সেখান থেকে গুলি করে শত্রু নিধন করে। বনের পথ দিয়ে যখন মার্কিন সৈন্যরা যায়, তখন গাছে লুকিয়ে থাকা গেরিলারা এক প্রান্তে টানা বাঁশের-কাঠের বর্শা ঢোকানো মাটি ভরা বস্তা ছেড়ে দেয়। তার আঘাতে মার্কিনিরা লুটিয়ে পড়ে। এ রকম অসংখ্য কৌশল

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

শ্রমিকদের মজুরি পুনর্নির্ধারণ, রেশন-আবাসন, চিকিৎসা ও পেনশন চালুর দাবি

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট

- জাতীয় ন্যূনতম মজুরি আইন প্রণয়ন কর।
- গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য ২৪ হাজার টাকাসহ সকল সেক্টরের শ্রমিকদের মজুরি পুনর্নির্ধারণ কর।
- শ্রমিকদের জন্য রেশন, আবাসন, চিকিৎসা-পেনশন ব্যবস্থা চালু কর।
- শ্রম আইন ও বিধিমালায় শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী ধারাসমূহ বাতিল কর।

উল্লিখিত দাবিতে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের উদ্যোগে ২১ অক্টোবর দেশব্যাপী দাবি দিবস পালিত হয়।

সংগঠনের ঢাকা নগর শাখার উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের ঢাকা নগরের সাধারণ সম্পাদক খালেকুজ্জামান লিপনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন, সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল, নগর নেতা অ্যাড. ফারুক হোসেন, হাবিবুর রহমান, রুবেল মিয়া, রফিকুল ইসলাম ও ইমরান হাবিব রুমন প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, চার জনের একটি পরিবারের শুধুমাত্র খাবারের খরচের জন্য প্রয়োজন ২২ হাজার টাকার বেশি। খাদ্য খরচ যদি মজুরির ৪০ ভাগ খরচ হয় অন্যান্য ব্যয় ৬০ ভাগ হলে চার সদস্যের পরিবারের জন্য প্রয়োজন ৫৫ হাজার টাকার বেশি। বাংলাদেশ ব্যাংক সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের সর্বনিম্ন বেতন ২৪ হাজার টাকা নির্ধারণের নির্দেশনা দিয়েছে, যা একটা মানদণ্ড। অন্যান্য বিবেচনায় সকল শ্রমিকের নিম্নতম মজুরি বর্তমান বাজারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে পুনর্নির্ধারণ করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার শ্রমিকের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ ও অর্থনৈতিক সুবিধা সংকুচিত করতে আইন করছে। আইনে শ্রমিকের সুরক্ষার ন্যূনতম যে সুযোগটুকু রয়েছে তার প্রয়োগ করছে না বরং আইনে শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী যে বিধিবিধানসমূহ রয়েছে সেইগুলির প্রয়োগ হচ্ছে। শ্রম দপ্তর এবং কলকারখানা প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তারা শ্রমিকদের উপর নিপীড়ন চালানোর সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে। তাই নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, সার্ভিসবুক প্রদানের আইন বাস্তবায়ন না করা আইনভঙ্গকারী মালিকদের শাস্তি হচ্ছে না। যুগের পর যুগ এই ধারা চলছে। ৮ ঘণ্টা কর্মদিবসের আইন থাকার পরেও কীভাবে ১২ ঘণ্টা কর্মদিবস কারখানায় চালু আছে। এসডিজি অর্জনের কথা বলা হচ্ছে অথচ প্রতিনিয়ত শ্রমজীবীদের দুর্দশার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, বৈষম্য এবং অনিশ্চয়তা সমাজে নৈরাজ্য-অস্থিরতা, অপরাধ প্রবণতা বাড়াবে। তাই একটি ভারসাম্যপূর্ণ শিল্পসম্পর্কের প্রয়োজনে শ্রমজীবীদের অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক হতে হবে। নেতৃবৃন্দ টিসিবি ফ্যামিটি কার্ডের এবং ওএমএস এর সাথে অবিলম্বে শ্রমজীবীদের জন্য সর্বজনীন রেশন চালুর দাবি জানান।

বাম গণতান্ত্রিক জোট ও বাংলাদেশ জাসদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

২৬ অক্টোবর বাম গণতান্ত্রিক জোট ও বাংলাদেশ জাসদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের এক মতবিনিময় সভা পুরানা পল্টনস্থ মুক্তিভবনের মৈত্রী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। বাম গণতান্ত্রিক জোটের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়ক সিপিবি'র সহকারী সাধারণ সম্পাদক মিহির ঘোষের সভাপতিত্বে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)'র সভাপতি কমরেড মো. শাহ আলম, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, বাংলাদেশ জাসদের সভাপতি শরীফ নুরুল আম্বিয়া, সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য কমরেড আব্দুস সাত্তার, সিপিবি'র কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, শাহীন রহমান, সাজ্জাদ জহির চন্দন, লুনা নূর, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম সবুজ, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী, বাসদ (মার্কসবাদী)'র মানস নন্দী, বাংলাদেশ জাসদের নির্বাহী সদস্য ডা. মুশতাক হোসেন, আনোয়ারুল ইসলাম বাবু, মনজুর আহমেদ মনজু, বাদল খান প্রমুখ।

সভায় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, বিদ্যুৎ সংকট, দুঃশাসন-নিপীড়ন, গণতন্ত্রহীনতা, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এবং নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন; নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের দাবিতে যুগপৎ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। নেতৃবৃন্দ মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ ও সমাবেশের ওপর নিপীড়নের তীব্র নিন্দা জানিয়ে গণ-আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

লালন সাঁই এর প্রয়াণ দিবসে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের আলোচনাসভা ও সঙ্গীতানুষ্ঠান

বাউল সম্রাট লালন সাঁইয়ের ১৩২তম প্রয়াণ দিবসে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে ১৭ অক্টোবর বাসদ কার্যালয়ে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং শেষে সংগীত পরিবেশন করেন চারণের শিল্পীবৃন্দ।

চারণ জেলা আহ্বায়ক প্রদীপ সরকারের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব জামাল হোসেনের সঞ্চালনায় আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন চারণের কেন্দ্রীয় সভাপতি নিখিল দাস, প্রগতি লেখক সংঘের সভাপতি জাকির হোসেন, চারণের জেলা সদস্য সেলিম আলাদীন প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বাউল কবি লালন ছিলেন শক্তিমান কবিসত্তার অধিকারী। তাঁর গানে উপমা-অলঙ্কার তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রয়োগ করেছেন। সহজভাবে সহজ কথা বলবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করতে পারেননি, অথচ অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। সাহিত্যিক অন্নদাশংকর রায় লিখেছেন, 'বাংলার নবজাগরণে রাম মোহনের যে গুরুত্ব বাংলার লোক মানসের দেয়ালী উৎসবে লালনেরও সেই গুরুত্ব।' ১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর লালনের মৃত্যুর পর 'হিতকরী' পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়–'নিজে

লিখাপড়া জানিতেন না, কিন্তু তাঁহার রচিত অসংখ্য গান শুনিলে তাঁহাকে পরম পন্ডিত বলিয়া বোধ হয়। তিনি কোন শাস্ত্রই পড়েন নাই, কিন্তু ধর্মালাপে তাঁহাকে বিলক্ষণ শাস্ত্রবিদ বলিয়া বোধ হইত।' লালন জাত-পাত, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। জাতের প্রশ্নে তিনি বলেন, 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে/ লালন বলে জাতের কী রূপ দেখলাম না এই নজরে।' আজ যখন সাম্প্রদায়িকতার আগুনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ঘর-বাড়ি, উপসনালয় আক্রমণ হয়, যখন বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে মৌলবাদী গোষ্ঠীকে পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়; তখন লালনের চিন্তা-মত জানা ও চর্চা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। আজও সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী গোষ্ঠী ও সরকারের রেষানলে পড়ে শরীয়ত বাউলকে জেলে যেতে হয়, আগুনে পুড়তে হয় বাউল রনেশ ঠাকুরের সংগ্রহশালা।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, কবিগুরু রবি ঠাকুরই প্রথম 'প্রবাসি' পত্রিকায় লালনের ২০টি গান প্রকাশ করার মাধ্যমে শিক্ষিত সমাজের মাঝে লালনের পরিচিতি তৈরি করেন। লালন ছিলেন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশ। তৎকালীন সময় জমিদারদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ প্রজাদের দুঃখের কথা 'গ্রামবার্তা' প্রত্রিকায় কাঙাল হরিনাথ লিখতেন, এতে রুষ্ট হয়ে ঠাকুর বাড়ির পেয়াদা তাকে ধরে নিয়ে যেতে চাইলে লালন তাঁর অনুসারীদের পাঠিয়ে তাদের হটিয়ে দেন। তাই আজ লালনের দর্শন থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমান ফ্যাসিবাদী শাসন ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আলোচকবৃন্দ জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, লালনের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বগুড়া জেলাসহ বিভিন্ন জেলায় আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

চট্টগ্রাম জেলা শাখা

লালন স্মরণে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র চট্টগ্রাম জেলা শাখার উদ্যোগে ১৭ অক্টোবর জেলা কার্যালয়ে আলোচনা সভা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ চট্টগ্রাম জেলার ইনচার্জ আল কাদেরি জয়, চারণের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আহমদ জসীম, বাসদ জেলার সদস্য আকরাম হোসেন, ছাত্র ফ্রন্ট নেতা রায়হান উদ্দিন, মিরাজ উদ্দিন, প্রীতম বড়ুয়া ও ঋজু লক্ষ্মী অবরোধ।

নেতৃবৃন্দ লালনের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে সকলকে আজকের সমাজ প্রগতির সামনে যে সংকট জগদ্দল পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

কর্নেল তাহের : সমাজ বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর এক লড়াকু জীবন

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

জনযোদ্ধারা আয়ত্ত ও প্রয়োগ করেছিল। বাংলাদেশের জনগণও মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিতে গিয়ে নানা কৌশল নিয়েছিল। তবে যুদ্ধ পরিচালনাটা ভেতর থেকে করা গেলে তা অনেক বেশি কার্যকর হতো। স্বাধীনতাকামী শহিদদের চেয়ে হানাদার দখলদারদের মৃত্যু সংখ্যা বেশি হতো। তারপরও মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার ৯ মাসের আঘাতে পর্যুদস্ত পাক হানাদার বাহিনী সমস্ত এলাকা থেকে গুটিয়ে আসছিল শহর ও ক্যান্টনমেন্ট অভিমুখে, আরও ৫/৬ মাস যুদ্ধ চললে ভারতীয় বাহিনীর প্রয়োজন হতো না। মুক্তিবাহিনীর হাতেই তাদের পরাজয় ঘটতো। এক্ষেত্রে পাক-ভারত যুদ্ধ এবং ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ হয়তো উভয়েরই চাওয়া ছিল। কারণ মুক্তিবাহিনীর কাছে চূড়ান্ত পরাজয় ঘটলে পাকবাহিনীর একটি সৈন্যও জীবিত থাকতো না। কারণ মুক্তিবাহিনী জেনেভা কনভেনশনের ধার ধারতো না। পাকিস্তানি বাহিনী নাকে খত দিয়ে জীবন বাঁচিয়েছে, আর ভারতীয় বাহিনীও বিজয়ের পুরো কীর্তি হাতে নিতে সক্ষম হয়েছে। মিত্র বাহিনী নামে ঢুকে আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান করলেও মিত্র বাহিনীর মর্যাদা রক্ষা করেনি। ভারতীয়দের কাছে পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণ মঞ্চায়িত হয়েছে। কর্নেল তাহের বলেছিলেন, জনগণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এই যুদ্ধ কারো অনুদান নয়। এবং আমরাই আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছি আমাদের সামর্থ্যে, আমাদের লড়াইয়ে।

পাকিস্তান উপনিবেশবিরোধী প্রতিটি গণসংগ্রামে পুরোভাগে থাকলেও বামপন্থিরা নেতৃত্বে আসতে ব্যর্থ হল

মুক্তিযুদ্ধের কিংবা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করতে গেলে, বামপন্থিরা কিন্তু বারবার আসে। সেই ৪৮ সাল থেকে শুরু করে সমস্ত আন্দোলনে বামপন্থিরা মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে। ভাষা আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, ছয় দফা, এগারো দফার যে আন্দোলন, ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, সমস্ত আন্দোলনেই বামপন্থিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু কেন নেতৃত্বে আসতে পারলো না? একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে বামপন্থিরা কেন ব্যর্থ হয়ে গেলো? এর একটা সঠিক মূল্যায়ন দরকার। বিশদে না গিয়ে এই ইতিহাস খুঁজতে হবে ১৯৬৬ সালে। যখন ১৯৫৬ সালের রুশ-চীন বিতর্ককে কেন্দ্র করে '৬৬ সালে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি চীনপন্থি ও রুশপন্থি পরিচয়ে বিভক্ত হয়ে গেল। আমাদের দেশের বামপন্থিরা তৎকালীন পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন কবলিত বাংলাদেশে কী করণীয় তার চেয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে গেলেন চীনপন্থা এবং মস্কোপন্থা নিয়ে। তাও যতোটা না মার্কসবাদ বনাম শোধনবাদকেন্দ্রিক মতাদর্শগত আলোচনা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি মেনে তার চেয়ে বেশি ছিল পক্ষ বিপক্ষ মেরুকরণ প্রক্রিয়া। প্রকৃত আদর্শগত সংগ্রামে দল বিভক্ত করার দরকার হয় না, প্রয়োজন ধৈর্য্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিজাত যুক্তি ও নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট করণীয় কাজে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া। মানুষ সে সময়ে উপনিবেশিক পূর্ব বাংলার মুক্তির পথ খুঁজছে। তার পথনির্দেশ বামপন্থিদের কাছ থেকে পাচ্ছে না। মওলানা ভাসানী সেই নির্দেশনা পথে অবিচল থাকলেও তাঁর মূলশক্তি সব বামপন্থিরা তখন তাঁকে ছেড়ে যাচ্ছে। তিনি একা একটা প্রতিষ্ঠানের মতো দাঁড়িয়ে লড়ছেন। এই সুযোগে ছয় দফা দিয়ে বুর্জোয়া রাজনৈতিক শক্তি সামনে চলে আসলো এবং তাদের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হলো। সেই আলোচনায় আমরা আজ বিশদে যাচ্ছি না। কর্নেল তাহের যে কথাটা বলেছিলেন, দেশের ভিতরে সব সেক্টরের হেড কোয়ার্টার নিয়ে আসবেন। আর ভারত প্রসঙ্গে তার একটা বক্তব্য আছে। অনেকগুলো কথাই তিনি বলেছেন—যে ভারতের সাহায্য এই মুহূর্তে দরকার, কিন্তু সাথে সাথে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ভারত খুব খুশি মনে আমাদের শিশুদের, সাধারণ মানুষ আর সেনাদের খাদ্য, আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিতে প্রস্তুত ছিলো কারণ ভারত জানতো, এতে করে আন্তর্জাতিক রাজনীতি আর কূটনীতির অঙ্গনে তাদের সম্মান ও ভাবমূর্তি বেড়ে যাবে। আর উপমহাদেশে তার আধিপত্য বিস্তারের নীতিও আরো সুদৃঢ় হবে। আসলে বাংলাদেশের ঘটনায় ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে সবচাইতে বেশি লাভবান হয়েছিলো ভারত। যুদ্ধের ব্যাপারে এতোটুকু বলতে পারি, আমাদের অফিসার ও সৈনিকরা মূলত ভারতের ইচ্ছা মাফিক তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল। অন্যদিকে বহুভাগে বিভক্ত বামপন্থিদের অবস্থা কি? বামপন্থিরা জনগণের পক্ষে স্বাধীনতার পক্ষে, এতে সন্দেহের কিছু নেই। কিন্তু সেই সময়ের বাস্তবতা হলো বামপন্থিরা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে খণ্ডিতভাবে লড়তে গিয়ে প্রাণ দিচ্ছে, কেউ দুই কুকুরের লড়াই বলে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, কেউ ভারতে গেলেও স্বতন্ত্র সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারছে না। মস্কোপন্থি নামে পরিচিত কমিউনিস্ট পার্টি '৭১ সালের মে মাসে দলীয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে লড়াইয়ের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নিল। আওয়ামী লীগ প্রবাসে সরকার গঠন করল। আর দেশে গণহত্যা চালাচ্ছে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী। গড়ে উঠলো গণপ্রতিরোধ। ফলে শুরু হল জনযুদ্ধ, জনগণের লড়াই। তাহলে এটা ছিলো জনযুদ্ধ, জনগণের লড়াই। কিন্তু জনগণের লড়াই যে চলছে, সেই যুদ্ধে জনগণের বাহিনী জনগণের সাথে মিলে এই জনযুদ্ধকে সশস্ত্র জনযুদ্ধে পরিণত করে সেটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই ছিল বামপন্থিদের কাজ। দেশের ভেতর থেকে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসা মুক্তিবাহিনী বিশেষ করে এফ এফ বাহিনীকে যুক্ত করে তাহেরের চাওয়া মতো কৃষক-শ্রমিক-জনতার যোদ্ধা বাহিনী গঠন করে গেরিলা তৎপরতার পাশাপাশি ঘাঁটি এলাকাও গড়ে তুলতে পারতেন। কিন্তু যদি ছেষট্টি সালে কমিউনিস্টদের এই বড় বিভ্রান্তি ও বিভক্তি না থাকতো এবং তারা যদি সংগঠিত থাকতেন তাহলে হয়তো এই চিন্তাকে বাস্তবে পরিণত করার জোর পাওয়া যেত। এরা তো অনেক জীবন দিয়েছেন, এরা লড়াই করেননি তা তো না। অনেকে বিভ্রান্তির কথা বলেন, তারা দুই কুকুরের লড়াই বলেছেন কিন্তু বিভিন্ন এলাকায় তারাই লড়াই করেছেন। কিন্তু গণজোয়ারের সেই সংগ্রাম তারা ধরে রাখতে কিংবা এগিয়ে নিতে পারেননি। যদি তারা সেভাবে দাঁড়াতে পারতেন, তাহলে মুক্তিবাহিনী পরবর্তীকালে যারা ট্রেনিং নিয়ে এসেছে কিংবা দেশের ভেতর ট্রেনিং নেয়ার চেষ্টা করছে, বিভিন্ন খণ্ড খণ্ডভাবে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়েছে তারা সবাই বামপন্থি যোদ্ধাদের সাথে কাতারবন্দি হতেন এবং কর্নেল তাহেরের মতো অনেক সামরিক বাহিনীর, বিডিআর, পুলিশের যুদ্ধে যোগ দেয়া সৈনিকেরা দেশের ভেতর ঘাঁটি করে যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারতেন।

সেনাবাহিনীকে জনগণের বাহিনীতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন

এর ফলে জনগণের একটা বিশাল সশস্ত্র লড়াইয়ের বাহিনী গড়ে উঠতো দেশের ভেতরে। সেটা হয়নি। তারপর যখন দেশ স্বাধীন হয়ে গেলো, তখন কর্নেল তাহের বললেন যে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যার অংশ আমরা ছিলাম, আমরা ভাড়াটে সেনা চরিত্র বিসর্জন দিয়ে গণমুক্তির বাহিনী হয়েছি। আর পাকবাহিনী ও তাদের দোসররা দখলদার খুনি যুদ্ধাপরাধী হিসেবে ধিকৃত হয়েছে। তাহলে, ১৯৭১ সালে সেনাবাহিনীর দুইটি চেহারা। একটা হচ্ছে শোষক শ্রেণির পক্ষে জনগণের উপর নির্যাতন চালানো, বাইশ পরিবারের স্বার্থে মানুষ খুন করা এবং পাকিস্তানি শোষকদের স্বার্থে জনগণের উপর নির্যাতন চালানো বাহিনী। আর আমরা এক অংশ তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিয়মকানুন ধরণ সবকিছু পরিত্যাগ করে কনভেনশনাল মার্সিনারি আর্মি থেকে জনগণের বাহিনী হয়ে গেলাম। স্বাধীন বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর এই দ্বিতীয় চরিত্রই থাকা উচিত ছিল। আমরা শোষক শ্রেণির বাহিনী হবো না, জনগণের উপর নিপীড়ন চালানোর বাহিনী হবো না। জনগণের উপর বোঝা হবো না। তাহের বলেন, জনগণ এবং আর্মির লোকেরা মুক্তিযুদ্ধে একসাথে যুদ্ধ করেছে, যুদ্ধ শেষে তাদের বিচ্ছিন্ন করাটা ঠিক হবে না। আমি মনে করি সেনাবাহিনীর রিফর্ম করা দরকার। সিপাই আর অফিসারদের মধ্যে যে দাসসুলভ সম্পর্ক আছে তার অবসান ঘটানো দরকার। তাছাড়া আমাদের মতো একটা দেশের সেনাবাহিনীর সদস্যরা শুধু শুধু ব্যারাকে বসে থাকবে এটা তো ঠিক না। দেশের এখন কত কাজ, দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সেনাবাহিনীর সদস্যদের পুরোপুরি যোগ দেয়া উচিত। তাহলে স্বাধীন বাংলাদেশের সেনাবাহিনী হবে জনগণের বাহিনী, গণবাহিনী। কিন্তু নেতৃত্ব বুর্জোয়া শ্রেণির হাতে এবং রাষ্ট্র পুঁজিবাদী পথে পরিচালিত হলে তা হবার নয় এবং তাই হয়েছে। তাকে প্রথম এডজুটেন্ট জেনারেল করা হলো, তারপর কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে দায়িত্বে আসলেন। এসেই তিনি বললেন, আমরা জনগণের উপর বোঝা হতে পারি না। জনগণের নিপীড়ক বাহিনীর পরিবর্তে, জনগণের, গোটা দেশের উন্নয়ন স্বার্থে এবং সমস্ত দিক থেকে জনগণের সাথে থেকে জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির হাতিয়ার হিসেবে এই সেনাবাহিনীকে কাজ করতে হবে। সেখানে তিনি লাঙ্গল বাহিনী গড়ে তোলেন। ওদের বললেন, তোমরা জমিতে যাও। ঐ সময় কৃষকের সাথে, শ্রমিকের সাথে মিলে আমরা যুদ্ধ করেছি, এখন স্বাধীন দেশ গড়ার জন্য ঐ কৃষক শ্রমিকের সাথে মিলে আমরা উৎপাদন কর্মকাণ্ডে যুক্ত হবো। জনগণের উপর বোঝা না হয়ে সেই বোঝা লাঘব করার জন্য জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা কাজ করবো। এইটা তো স্বাধীনতার পরের শাসকগোষ্ঠী চায় নাই। বা এই কথার সঙ্গে অন্যরা একমত হন নাই, যে কারণে তিনি তখন এটা বাস্তবায়ন করতে পারলেন না, বাঁধার সম্মুখীন হলেন। খেয়াল করে দেখেন, একদিকে একটা পা হারিয়ে আসছেন, আবার ব্রিগেড কমান্ডার পদে কুমিল্লায় এসেছেন এবং তার খেতাবও ছিলো। বীর উত্তম ছিলেন তিনি। প্রমোশন নিয়ে ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারতেন। সেদিকে গেলেন না। ঐ যে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা, সেটা নিয়ে তিনি আবার দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন।

বিপ্লবী পার্টির খোঁজে কর্নেল তাহের

শোষণমুক্ত সমাজের যে স্বপ্ন তার মাথায় ছিলো, তা বাস্তবায়ন ঘটাতেই সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে সর্বহারা পার্টির যে আন্দোলন তার সঙ্গে একটা যোগাযোগ তার হয়েছিলো। সিরাজ সিকদার স্বাধীনতা যুদ্ধেও বিশাল ভূমিকা রেখেছিলেন। বরিশালের পেয়ারা বাগান থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি। কিন্তু স্বাধীনতার পরে যে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ও রণনীতি তিনি নিলেন সেটাকে কর্নেল তাহের ঠিক মনে করলেন না। কারণ, সিরাজ সিকদার পাকিস্তান আমলে বললেন, পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ, কলোনি। এটা ঠিক ছিলো। কিন্তু স্বাধীনতার পর উনি বলে বসলেন যে, এখন ভারতের কলোনি হয়ে গেছে। কর্নেল তাহের এ বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারে নাই। মস্কোপন্থিরা গাঁটছড়া বেঁধে আছেন আওয়ামী লীগের সঙ্গে। তারা ভাবছেন শেখ মুজিবকে সঙ্গী করে সমাজতন্ত্র কায়েম করবেন। তাহের সে আশা ছেড়েছেন আগেই তাই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কোন ফায়দা নেই। কিছু চীনপন্থি যারা স্বাধীনতাকে মেনেই নেয়নি তাদের সঙ্গে যোগাযোগও অর্থহীন। যোগাযোগ করেন প্রতিষ্ঠিত বামপন্থি মোহাম্মদ তোয়াহা, আবুল বাশার, সিরাজুল হোসেন প্রমুখ চীনপন্থি নেতাদের সঙ্গে। কিন্তু তারা বলেন এই মুহূর্তে বাংলাদেশ কোন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে সংগ্রামের বা সংস্কার উদ্যোগের উপযোগী নয়। ক্ষমতাসীনরা রুশ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসর ভারতের দালালে পরিণত হয়েছে, তাই জাতীয় মুক্তির প্রশ্ন এখনও অমিমাংসিত। এটা নিস্পত্তির পরও পুঁজিবাদ আরও খানিকটা বিকশিত হওয়ার পর সমাজতন্ত্রের ডাক দিতে হবে। দেখা করলেন বিশিষ্ট বামপন্থি নেতা বদরুদ্দীন উমরের সাথে। উমর সাহেব পড়াশোনা জানা মানুষ। তিনিও মার্কসবাদের নানা ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝালেন দেশ এখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে নেই। ক্রাচে ভর দিয়ে শহরময় ঘুরে তাহের খুঁজছেনে একটি দল, যার সঙ্গে তার চিন্তার মিল হবে। ছোট ভাই আনোয়ারকে একদিন বললেন, 'ভাবলাম সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে কথা বলে একটা পথ পাওয়া যাবে। ভেবেছিলাম সব বামপন্থিরা মিলে যৌথভাবে কিছু করা যায় কিনা। কিন্তু সবাই তো যার যার পুকুরে সাঁতার কাটছে। আর সিনিয়র নেতারা সব থিওরিটিক্যালি কোন স্টেপ ভুল, কোনটা শুদ্ধ এই অঙ্ক করতে করতেই জীবন পার করে দিচ্ছেন। আমার মনে হয় পরিস্থিতিটাকে তারা খুব মেকানিক্যালি দেখছেন। তারা কেউ মনে করছেন না যে এ মুহূর্তে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করা সম্ভব' (ক্রাচের কর্নেল : শাহাদুজ্জামান; পৃ. ১৯৭)। সে সময়ে তার পরিচয় হয় সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে। তার মাধ্যমে জাসদের বক্তব্যের সাথে পরিচিত হন। জাসদের যে বক্তব্য ছিলো, আমরা লড়ছি সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে বুর্জোয়া শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য, সেটা সঠিক মনে করে তিনি জাসদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলেন, অঘোষিতভাবে।

সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করে আরও নিবিষ্টভাবে জড়িয়ে গেলেন জাসদ এর সাথে

মুক্তিযুদ্ধের নবম সেক্টরের কমান্ডার মেজর জলিলকে যুদ্ধের পর শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। তার বিচারের দায়িত্ব পড়েছিল কর্নেল তাহেরের ওপর। মেজর জলিলের অঞ্চলে ভারতীয় সৈন্যরা পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্রসহ সম্পদ লুটে নিচ্ছিল আর তাতে বাধা দিয়েছিলেন মেজর জলিল। এটা তাহের জানতেন। কিন্তু জলিলের এই ভারত বিরোধিতায় সরকারের অনেকেই অপছন্দ করেছিলেন, নাখোস ছিলেন ভারতীয় কর্মকর্তারাও। জলিলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে আনা হয় খুলনার এক প্রাক্তন সরকারি কর্মকর্তাকে। যে যুদ্ধের পুরো সময় পাক বাহিনীকে সহযোগিতা করে গেছে। সাক্ষ্য দিতে এলে তাকে ঘর থেকে বের করে দেন তাহের। বলেন, 'দিস ইজ অ্যাবসার্ড। মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডারের বিরুদ্ধে একজন যুদ্ধবিরোধী সাক্ষি দিতে পারে না। গেট আউট' (ক্রাচের কর্নেল; শাহাদুজ্জামান পৃ. ১৯১)। তাহের জলিলকে বেকসুর খালাস দেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে জলিল তার চাকরি থেকে অব্যাহতি নিয়ে স্বাধীনতাত্তোর দেশের প্রথম বিরোধী দল জাসদে যোগ দেন। সে সময় জলিল তাহেরকেও আহ্বান জানান, স্যার, আপনিও চলে আসেন। আর্মিতে থেকে কী লাভ? তখন তাহের তাকে বলেছিলেন, 'জলিল, হাউ ফার ডু ইউ নো এবাউট মি? সময় বলবে সব। আই স্টিল ওয়ান্ট টু ট্রাই উইদিন দিস সিস্টেম' (ক্রাচের কর্নেল; শাহাদুজ্জামান; পৃ. ১৯২)। কিন্তু এর পরপরই তাহের এর উপলব্ধির পরিবর্তন হয়। কুমিল্লা ব্রিগেডে তাঁর কাজ অনেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তারই পছন্দ হচ্ছিল না, একই সময়ে সেনাবাহিনীর মধ্যে একটা অভ্যুত্থান চেষ্টার খবর তিনি পান এবং শেখ মুজিবকে

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

কর্নেল তাহের : সমাজ বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর এক লড়াকু জীবন

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

তা অবহিত করেন। কিন্তু শেখ মুজিব তাকে বিশ্বাস না করে নিজের কাজে মনযোগ দিতে বলেন। কুমিল্লা ব্রিগেড থেকে তাঁকে বদলি করা হয় ডিরেক্টর ডিফেন্স পারচেজ হিসেবে। তাহের এটা সহজে মেনে নিতে পারেননি। তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন যে, তাঁর একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় চলে এসেছে। পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে আলাপ করেন তাহের। সবাই তাঁকে আরও ভাবতে বলেন। তাহের পরে স্ত্রী লুৎফাকে বলেন, ওদের লাইফে তো আর পলিটিক্যাল এজেন্ডা নাই। আর্মিতে ক্যারিয়ার করাই মূল ব্যাপার। আমার সাথে ওদের মিলবে না। আমি কিন্তু রিজাইন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। একটু কষ্ট হবে তোমার। এই লাইফে কি তোমার খুব মোহ জন্মেছে?' (ক্রাচের কর্নেল; শাহাদুজ্জামান; পৃ. ১৯৪) সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগের আনুষ্ঠানিক চিঠিটি তাহের জমা দেন ১৯৭২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর। পদত্যাগপত্রের শেষে তিনি লেখেন, 'আমি অনুভব করি ষড়যন্ত্র এখনো চলছে এবং আরও অনেকে এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে। এই ধরনের ক্ষমতা দখল হচ্ছে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে যাওয়া এবং এটাকে অবশ্যই রুখতে হবে।....এধরনের সেনাবাহিনীতে আমার কাজ করা সম্ভব নয়। আমার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ একজন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অফিসার হিসেবে নয় বরং একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে, আমি এটাকে আমার জন্য অত্যন্ত সম্মানজনক বলে মনে করি। জনগণের স্বার্থই আমার কাছে সর্বোচ্চ। আমি সেনাবাহিনী ত্যাগ করে জনগণের কাছে ফিরে যেতে চাই, যারা মুক্তিযুদ্ধকালে আমার চারদিকে জড়ো হয়েছিল। আমি তাদের বলব কী ধরণের বিপদ তাদের দিকে আসছে' (অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ, কর্নেল তাহের ও জাসদ রাজনীতি; আলতাফ পারভেজ; পৃ. ২১৩)। এর মধ্যে আপনারা শুনেছেন, তিনি নদী ড্রেজিং আর সংস্কারের দাবি তুলেছিলেন। গোপনে জাসদের সাথে যুক্ত থাকাকালীন তিনি পরিষ্কার বললেন, নদী-জমি, জনগণ—এই যে বাংলাদেশের সম্পদ, এই দিয়ে সাড়ে সাত কোটি মানুষ কেন, পনেরো কোটি মানুষও সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারবে, তা অসম্ভব নয়, যদি তা সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায়। ওসমানী সাহেব তখন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে। তিনি তাহেরকে নারায়ণগঞ্জ ড্রেজিং সংস্থার ডিরেক্টর পদে যোগ দিতে বলেন। বাংলাদেশের নদী এবং বন্যা তাঁর আগ্রহের বিষয়, এ নিয়ে তিনি লিখেছেন 'সোনার বাংলা গড়তে হলে' লেখাতে। এরকম একটা বেসামরিক চাকরিতে থেকে রাজনীতির কাজে যুক্ত থাকাটা সহজ হবে বলে মনে করে তা গ্রহণ করতে রাজি হন তাহের।

মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা প্রতিধ্বনিত হয়েছিল জাসদের ঘোষণায়

১০ এপ্রিল ১৯৭১, তখন যে প্রবাসী সরকার, তাজউদ্দীনের সরকার, সেই সরকার তিনটা লক্ষ্যকে সামনে রেখে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়—সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার। তারা ঘোষণা দেন, 'এই জন্যই আমরা স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু করিলাম।' এই ঘোষণার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিলো। আর দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে সংবিধানে লেখা হয়েছিলো—গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও স্বাধীন জাতীয় বিকাশের জাতীয়তাবাদ হলো ভিত্তি যে নীতিতে দেশ পরিচালিত হবে। জনগণের ক্ষমতায়নের গণতন্ত্র। সেটা কী? আজকাল আর এটা কেউ বলে না। গণতন্ত্র মানে কী? সকল মানুষের সম অধিকার। মানুষের ছয়টা মৌলিক অধিকার আছে—অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান এবং কাজ। এই ছয়টা অধিকার যদি সকল মানুষ পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতে না পারে, তাহলে তাকে সকল নাগরিকের জন্য স্বাধীনতা বলা যায় না। তাহলে যখন আমরা কোনো দেশকে স্বাধীন বলি, কোনো শাসনকে গণতান্ত্রিক বলি, তখন এই মৌলিক অধিকারগুলি সমস্ত মানুষের জন্য নিশ্চিত হতে হবে। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতার পরে মানুষের যে সীমিত অধিকার ছিলো সেটাও কমতে শুরু করলো। জনগণের ক্ষমতায়ন তো দূরে থাক, মানুষের অধিকার ক্রমে হরণ করা শুরু হলো। এবং ধনী-গরিব বৈষম্য বাড়তে শুরু করলো। যারা যত বেশি দরিদ্র তাদের মর্যাদা ততো কম। তাদের কথার কোনো গুরুত্ব নাই। তাদের মৌলিক অধিকারের কোনো নিশ্চয়তা নাই। এইভাবে যখন চলতে শুরু করেছিলো, তখন স্বাভাবিকভাবেই কর্নেল তাহের জাসদের সাথে যুক্ত হয়ে জাসদের যে বিপ্লবী অঙ্গীকার ছিলো—যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষারই প্রতিধ্বনি—তা বাস্তবায়ন করতে চান। যেভাবে দেশ চলছে, তা এক বিশ্বাসঘাতকতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। ফলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যদি বাস্তবায়ন করতে হয়—সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ....তাহলে, আরেকটা যুদ্ধ লাগবে, বিপ্লব করতে হবে। এই বিপ্লব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর। কিন্তু এর দায়িত্ব শুধু কর্নেল তাহেরকে দিলে হবে না। কর্নেল তাহের তো জাসদের যে সিদ্ধান্ত, সেই মোতাবেক অগ্রসর হয়েছিলেন। তাহলে, জাসদ সেই সময়ের পুরো চিত্র কর্নেল তাহেরের সামনেও হাজির করে নাই, সারা দেশের নেতা-কর্মী, জনগণের সামনেও হাজির করে নাই। সেটা কীরকম?

৭ নভেম্বরের বিপ্লব চেষ্টার ব্যর্থতা এককভাবে কর্নেল তাহেরের নয়

আমি আগে বলেছিলাম, বামপন্থিরা কেনো মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বে আসতে পারলো না, এটা খুঁজতে হবে ছেষট্টি সালে গিয়ে। আর ৭ নভেম্বরের বিপ্লব চেষ্টা কেনো ব্যর্থ হলো এটা খুঁজতে হবে জাসদের জন্মলগ্নের ইতিহাসে বিশেষ করে ১৯৭৪ সালের ১৭ মার্চে গিয়ে। সেসময় চলছে লুটতরাজ, রিলিফের মাল চুরি হয়ে যাচ্ছে, শেখ মুজিব বলছেন, সাড়ে সাত কোটি রিলিফের কম্বল এসেছে তাহলে আমার কম্বল কোথায়? তারপর বিভিন্ন বক্তৃতায় বলা শুরু করলেন, 'সবাই পায় সোনার খনি, আমি পাইলাম চোরের খনি', 'সব চাটার দল, চেটেপুটে খেয়ে যাচ্ছে' ইত্যাদি। উনি বলছেন, কিন্তু বাস্তবতার বিরুদ্ধে তো ব্যবস্থা নিতে পারছেন না।

১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর জাসদ গঠনের কয়েক মাসের মধ্যেই ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জাসদ ৩০০ আসনের মধ্যে ২৭৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং ১টি মাত্র আসনে বিজয়ী ঘোষিত হয়। সদ্য স্বাধীন দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী দল হিসেবে তাঁদের নিরঙ্কুশ বিজয় নিশ্চিত থাকা সত্ত্বেও কমপক্ষে ১৮ থেকে ২৮টি আসনে বিরোধী এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বিজয়ী হয়ে আসতে পারতো বলে যে পরিস্থিতি পরিস্কার ছিল, তাকে আওয়ামী লীগ সরকার সন্ত্রাস, কারসাজি ও ক্ষমতার স্বেচ্ছাচারী প্রভাব খাটিয়ে উল্টে দেয়। এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে (ডাকসু) ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে জাসদের ছাত্র সংগঠনের নিশ্চিত বিজয় নস্যাৎ করে দেয়। জাসদের অন্যতম সহসভাপতি বরিশালের ডা. আজহার উদ্দিনকে হাইজ্যাক করে নমিনেশন জমা দিতে দেয়নি। গোপালগঞ্জের এক প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাশ করানোর তাগিদ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী ন্যাপের কমলেশ বেদজ্ঞ ও তার প্রধান প্রচার কর্মী সিপিবি'র জেলা সম্পাদক অলিউর রহমান লেবুসহ ৪ জনকে খুন করা হয়। কুমিল্লার দাউদকান্দিতে আব্দুর রশীদ ইঞ্জিনিয়ারের নিশ্চিত বিজয় ঠেকাতে ভোটের বাক্স হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় এনে খন্দকার মোশতাক আহমেদকে জিতিয়ে দেয়া হয়। বরিশালে জাসদ সভাপতি মেজর জলিলকে হারিয়ে আওয়ামী লীগের হরনাথ বাইনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। টাঙ্গাইলের ড. আলীম আল রাজিকে জালিয়াতি করে হারানো হয়। নির্বাচন পরবর্তী ১১-১৩ মে জাসদের জাতীয় সম্মেলন থেকে বলা হয়, ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি আমরা বাংলাদেশে আর কোনোদিনও ঘটতে দেবো না। বাংলাদেশের বুকে এরপরে যদি আর কোন নির্বাচন হয় তো সেই নির্বাচন হবে মেহনতি জনতার নির্বাচন। শোষকগোষ্ঠীর ভণ্ড গণতান্ত্রিক নির্বাচন নয়'। জাসদ সারাদেশব্যাপী ২৭ মে গণবিক্ষোভের ডাক দেয়। নরসিংদীতে পুলিশের গুলিতে ৯ জন নিহত ও ৫ জন আহত হয়। সেই সময় জাসদের মধ্যে দুই ধরনের মতবাদিক প্রবণতা সামনে আসে। একটি হল শাসকদল যেভাবে গণবিচ্ছিন্ন ও জনসমর্থনহীন হয়ে পড়েছে এবং এখনও তার শ্রেণীগত সংহত অবস্থান ও মজবুত ক্ষমতা ভিত্তি তৈরি হয়নি, ফলে এখনই সরকার উচ্ছেদের ডাক দিয়ে সেই লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া দরকার। অন্যটি ছিল জাসদ মূলত, এখনও সাংগঠনিকভাবে ছাত্র-যুবক শক্তি নির্ভর ও পেটি বুর্জোয়া শ্রেণিতে বিচরণশীল শক্তি। কিন্তু জাসদের লক্ষ্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল শক্তি শ্রমিক-কৃষক মেহনতি মানুষের শক্তি সমাবেশ ঘটানো ও তাঁদের নিজস্ব সংগঠিত শক্তি নির্মাণের প্রক্রিয়ায় জাসদের বিপ্লবী শ্রেণি ভিত্তি রচিত হওয়া দরকার। তাছাড়া জাসদ এখনও নিজেকে সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী দল হিসাবে দাবি করার জায়গায় পৌঁছায়নি। দ্বিতীয়, মতটি অধিকতর গ্রহণযোগ্যতা পায়। ফলে গ্রামে গ্রামে কৃষক বৈঠক করে রিলিফ কার্যক্রমের দুর্নীতি ও দুর্নীতিবাজ আওয়ামী লীগের রিলিফ চেয়ারম্যানদের জবাবদিহিতা, ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বিতরণ, কৃষি উপকরণ সরবরাহ, সুদমুক্ত কৃষি ঋণ প্রদান ইত্যাদি দাবিতে সংগঠনের কাঠামো বিস্তার ও হাজার হাজার কৃষক নিয়ে রিলিফ চেয়ারম্যানদের ঘেরাও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া কারখানা-প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয়করণ করা হয়েছিল। জাতীয়করণকে সমাজতন্ত্রের সাথে মেলানো হয়েছিল। জাতীয়করণ মানেই সমাজতন্ত্র নয়। জাতীয়করণ করতে হলে একটা কারখানার কী কাঁচামাল আছে, কী তার দায় দেনা আছে, কী উৎপাদিত পণ্য আছে এসব হিসাব জানতে হয়। একটা চায়ের দোকানও যদি জাতীয়করণ করতে হয়, তাহলেও জানতে হয় কী হাঁড়ি পাতিল আছে, কী টাকা-পয়সা দায়দেনা আছে ইত্যাদি। একে বলে অডিট (ইনভেন্ট্রি) কিন্তু কোনো কারখানাতেই সেভাবে অডিট হয় নাই। সব এক ধাক্কায় জাতীয়করণ হয়ে গেছে। শাসকগোষ্ঠীর লোকেরা কারখানার প্রশাসক হয়ে গেলো। এরপর তারা দেদারসে লুটপাট শুরু করলো। সমস্ত জায়গায় লাল বাহিনী, নীল বাহিনী ইত্যাদি বিভিন্ন বাহিনী তৈরি করে শ্রমিকদের উপর নির্যাতন শুরু করল। চট্টগ্রামের বাড়বকুণ্ডে আর আর টেক্সটাইল মিলে ৮/১০ জন শ্রমিককে জবাই করেছিলো আওয়ামী লাল বাহিনী। এভাবে সারাদেশে শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করা হয়েছিল। তখন জাসদের সিদ্ধান্ত ছিলো শিল্প কারখানাসমূহে লুটপাট, দুর্নীতি শ্রমিক নির্যাতন বন্ধের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলা। কারখানা প্রশাসক ও সহযোগী দালাল শ্রমিক সংগঠনের বদলে সত্যিকার শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বশীল শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলা। এই লক্ষ্যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের ঘেরাও করা। ঘেরাও করলে শ্রমিকদের মধ্যেও জাসদের একটা শক্তি গড়ে উঠবে। এভাবে শ্রমিক কৃষকদের ঐক্য গড়া। কিন্তু, এসময় আরেকটা বিষয় ছিলো। আজকে যে কালোআইন আমরা বলি, বিশেষ ক্ষমতা আইন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, এসব আইন তখন করতে পারতো না। কেনো করতে পারতো না? আমাদের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকার অধ্যায়ের ২৬ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে—'২৬। ১. এই ভাগের বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস্য সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে। ২. রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস্য কোন আইন প্রণয়ন করিবেন না এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে'।

সেই সময় আওয়ামী লীগ সংবিধানে দ্বিতীয় সংশোধনী আনে। এক নম্বর সংশোধনী হলো আলবদর, রাজাকার এরা মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারবে না। দুই নম্বর সংশোধনী হলো, বাংলাদেশের সংসদে যদি তিন ভাগের দুই ভাগ সদস্য কোনো আইন পাশ করে, এটা যদি মৌলিক অধিকারের বিরুদ্ধেও যায়, তাহলে তা কার্যকর থাকবে। এভাবেই গণতন্ত্রের বুকে প্রথম ছুরি চালানো হলো। ঐ সংশোধনী না থাকলে বিশেষ ক্ষমতা আইন ইত্যাদি কালাকানুন নিয়ে আদালতে যাওয়া যেত। কালোআইন প্রণয়ন করতে পারতো না। কাউকে গ্রেপ্তার করতে ওয়ারেন্ট লাগে এবং গ্রেপ্তার করার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নিকটবর্তী কোনো আদালতে হাজির করতে হয়। তার উপর শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন করা যায় না। এটা হলো নিয়ম। কিন্তু বিশেষ ক্ষমতা আইন করার পর পুলিশ যদি কাউকে সন্দেহ করে, তাহলে তাকে গ্রেপ্তার করতে পারে, আদালতে হাজির না করলেও চলবে এবং তাকে জামিন দেওয়াও নিষেধ। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই পুলিশের সন্দেহের ভিত্তিতে তাকে বিনা বিচারে বছরের পর বছর কারাগারে রাখা যাবে। এখনও দেখেন, এই যে আওয়ামী লীগ, বিএনপি বিতর্ক করে। বিএনপি বলে, পুলিশ আমাদের মারে-ধরে, মামলা দেয়, কিন্তু ঐটা বলে না যে দুই নম্বর সংশোধনী আছে বলেই এটা সহজে করা যায়। আওয়ামী লীগ, বিএনপি কেউই এটা বাতিল করার কথা বলে না। এটা বাতিল না করলে এমন আইন তো আইনি ছায়ার ছায়াতলে করতেই থাকবে। বিশেষ ক্ষমতা আইন তৈরি করেছিলো আওয়ামী লীগ। কিন্তু বিএনপি, জাতীয় পার্টি কেউ এটা বাতিল করে নাই। বরং তারাও নিজ স্বার্থে ব্যবহার করেছে, নতুন নতুন কালাকানুনও তৈরি করেছে। ঐ সময় ১৯৭৪ সালে ১৭ মার্চ জাসদের পক্ষ থেকে এই দ্বিতীয় সংশোধনী ও বিশেষ ক্ষমতা আইনের বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অফিসে একটা স্মারকলিপি দেওয়ার কথা ছিলো। অর্থাৎ, মূলত তিনটা কাজ। কৃষকদেরকে সংগঠিত করে দুর্নীতিবাজ রিলিফ চেয়ারম্যানদের ঘেরাও করা; শ্রমিকদের নিয়ে দুর্নীতিবাজ মিল কারখানার অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের ঘেরাও করা এবং বিশেষ ক্ষমতা আইন নামক কালাকানুনের বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি দেওয়া।

১৯৭৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি জাসদের ২৯ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। হরতাল থেকে এই দাবি পূরণে ১৫ মার্চ পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয়া হয় এবং তারপর ১২ দফাভিত্তিক আন্দোলনের কথাও ঘোষিত হয়। সেই ১২ দফার দুই নম্বর দফায় ছিল, 'কলকারখানার অসৎ প্রশাসন ও কর্মকর্তাদের ঘেরাও করা হবে। চার নম্বর দফায় ছিল, ধনী কৃষক-জোতদারদের ঘেরাও করা হবে, ৫ নং দফায় ছিল, রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যানদের ঘেরাও করা হবে, ৭ নং দফায় ছিল, খাস জমি ও অতিরিক্ত জমি দখলের জন্য ঘেরাও করা হবে, ১১ নং দফায় ছিল, এই পর্যায়ে কেন্দ্রীয় কর্মসূচি হিসেবে গণভবন, সেক্রেটারিয়েট ও বঙ্গভবন ঘেরাও করা হবে'। ১৭ মার্চ পল্টনে জনসভার ডাক দেয় জাসদ। সেখানে এই ১২ দফা কর্মসূচি ঘোষিত

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

শ্রমজীবীদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রেশন ব্যবস্থা চালুর দাবি

খাদ্যমন্ত্রী বরাবর স্কপের স্মারকলিপি পেশ

শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে শ্রমজীবীদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সর্বজনীন রেশন ব্যবস্থা চালুর দাবিতে ১২ অক্টোবর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ এবং খাদ্যমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়। একই দাবিতে দেশের বিভিন্ন জেলায় জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে খাদ্যমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

স্কপের যুগ্মসমন্বয়ক চৌধুরী আশিকুল আলমের সভাপতিত্বে এবং অপর যুগ্মসমন্বয়ক আহসান হাবিব বুলবুলের পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন স্কপ নেতা রাজেকুজ্জামান রতন, সাইফুজ্জামান বাদশা, কামরুল আহসান, শামীম আরা, বাদল খান, আব্দুল ওয়াহেদ, আজিজুন নাহার, নুর মোহাম্মদ আকন্দ, আবুল কালাম ও রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের জিডিপি বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে সাফল্যের কৃতিত্ব শ্রমজীবী মানুষ। তারা হাড়ভাঙা পরিশ্রম আর ঘাম ঝরিয়ে প্রতিনিয়ত সম্পদ তৈরি করে যাচ্ছে কিন্তু দেশের প্রবৃদ্ধি ও উৎপাদনের সুফল ভোগ করতে পারছে না। উপরন্তু দ্রব্যমূল্য যে অনুপাতে বাড়ছে, শ্রমজীবীদের আয় সে অনুপাতে বাড়ছে না। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে শ্রমজীবীদের আয়ের ৪৭ দশকিম ৬৯ শতাংশই খাদ্য বাবদ ব্যয় করতে হয়। বাড়ছে বাড়িভাড়া, পরিবহণ-চিকিৎসা, শিক্ষা ব্যয়। ফলে শ্রমজীবীদের জীবন হয়ে পড়ছে দুর্বিষহ, অপুষ্টিজনিত কারণে কমছে পরিশ্রম করার ক্ষমতা।

নেতৃবৃন্দ বলেন, শ্রমজীবীদের হাতে টাকা থাকলে তা দেশের বাজারকে শক্তিশালী করে। যার ফলে শিল্পের বিকাশ ঘটে। যে কারণে পৃথিবীর সকল উন্নত দেশ খাদ্যপণ্যের দাম কম রাখে, যেন শ্রমজীবীরা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে পারে। আমাদের দেশেও ব্রিটিশ শাসনামলে সাধারণ মানুষের জন্য রেশন ব্যবস্থা চালু ছিল এবং স্বাধীনতার পর কিছু দিন তা চালু ছিল। বিশ্বব্যাংকের চাপে পরবর্তীতে রেশন ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। ফলে শ্রমজীবীদের প্রকৃত আয় কমছে এবং বৈষম্য বাড়ছে। শ্রমজীবীদের জীবনমান ক্রমাগত নিচের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, সামরিক বাহিনী, পুলিশ ও বর্ডার গার্ডদের রেশন দেয়া হয়। উৎপাদনের প্রধান চালিকাশক্তি স্বল্প মজুরির শ্রমজীবী মানুষ রেশন পাওয়ার যৌক্তিক দাবিদার।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের শ্রমজীবীদের জন্য চাল-আটা, ডাল-তেল, চিনি অন্তত এই পাঁচটি দ্রব্য রেশনে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

সমাবেশ শেষে খাদ্য মন্ত্রণালয় অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল ও একটা প্রতিনিধি দল দিয়ে খাদ্যমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করেন।

সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার দাবি

গণকমিটি : মাগুরা জেলা

সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত, স্বাস্থ্যখাতে অব্যবস্থাপনা দূর করার দাবিতে গণকমিটি মাগুরা জেলার উদ্যোগে ১৮ অক্টোবর চৌরঙ্গী মোড়ে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের আহ্বায়ক এটিএম মহব্বত আলীর সভাপতিত্বে এবং সদস্যসচিব প্রকৌশলী শম্পা বসুর পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমিটির যুগ্মআহ্বায়ক কাজী নজরুল ইসলাম ফিরোজ, যুগ্মআহ্বায়ক এটিএম আনিসুর রহমান।

নেতৃবৃন্দ বলেন, চিকিৎসা ক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য চলছে। সরকারি হাসপাতালে ডাক্তার-নার্স, টেকনিশিয়ানের রয়েছে সংকট। এতে অধিকাংশ দরিদ্র মানুষ চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ওষুধ-টেস্ট, অপারেশনসহ বেশিরভাগ চিকিৎসা সেবা হাসপাতালের বাইরে থেকে নিতে হয়। উপজেলার চিকিৎসা সেবা আরও খারাপ।

নেতৃবৃন্দ সরকারি হাসপাতালের বিরাজমান সংকট সমাধান করে জনগণের যথাযথ চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান।

সোনারগাঁও টেক্সটাইল শ্রমিক-কর্মচারীদের উপর হামলার প্রতিবাদ

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট : বরিশাল

২৭ অক্টোবর সোনারগাঁও টেক্সটাইল শ্রমিক-কর্মচারীদের উপর হামলাকারীদের শাস্তির দাবিতে শ্রমিক ফ্রন্টের উদ্যোগে অশ্বিনী কুমার হল চত্বরে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রমিক ফ্রন্ট জেলা শাখার সহসভাপতি দুলাল মল্লিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক সদস্য জনার্দন দত্ত নান্টু, বাসদ বরিশাল জেলা শাখার সদস্যসচিব ডা. মনীষা চক্রবর্তী, শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সহসাধারণ সম্পাদক ইমাম হোসেন খোকন, প্রস্তাবিত সোনারগাঁও টেক্সটাইল শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সহসভাপতি হারুন শরীফ, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন বরিশাল জেলা শাখার সভাপতি জাকির হোসেন, সোনারগাঁও টেক্সটাইল ইউনিয়নের মামলার আইনজীবী ও বিশিষ্ট নাগরিক অ্যাড. আবু আল রায়হান, দর্জি শ্রমিক ইউনিয়ন মহানগর শাখার সভাপতি তুষার সেন, শ্রমিক ফ্রন্ট নেতা মানিক হাওলাদার প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, হাসান এবং মুরাদ দুইজন শ্রমিককে মালিক কর্তৃপক্ষ কারখানায় ঢুকতে না দিলে শ্রমিকরা প্রতিবাদ করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মালিকপক্ষের দালাল শাহীন শেখ, মনির মোল্লা, মো. জাকির হোসেন, মো. গনি, মনির, হাফিজ, বজলুসহ ১০-১২ জন লাঠিসোঁটা নিয়ে শ্রমিকদের উপর হামলা চালায়। হামলায় ৭ নারী শ্রমিকসহ ১৫ জন গুরুতর আহত হয়; যাদের মধ্যে ৭ জন হাসপাতালে ভর্তি আছেন। এই প্রতিবাদে শ্রমিকরা সোনারগাঁও টেক্সটাইলের সামনে অবরোধ করে। পরে মালিক সন্ত্রাসীদের কারখানা থেকে বের করে বহিষ্কার করার আশ্বাস দেন এবং শ্রমিকদের উপর ছাঁটাই-নির্যাতন বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিলে শ্রমিকরা সড়ক ছেড়ে দেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সোনারগাঁও টেক্সটাইলের শ্রমিকরা ইউনিয়ন গঠনের আবেদনের পর থেকে মালিক শ্রমিকদের হয়রানি-নির্যাতন শুরু করে।

নেতৃবৃন্দ শ্রমিকদের উপর হামলার তীব্র নিন্দা জানান এবং হামলাকারীদের কারখানা থেকে স্থায়ী বহিষ্কার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

১০ দফা দাবিতে কৃষিমন্ত্রীকে স্মারকলিপি প্রদান

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট এবং বোরো চাষ পুনর্বহাল, বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগ্রাম পরিষদ পটিয়া উপজেলার উদ্যোগে ২৬ অক্টোবর ইউএনও-এর মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রী ও জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। ১০ দফা দাবি হচ্ছে ▫ পটিয়ার অনাবাদী পতিত জমি চাষে বেড়িবাঁধ ও স্লুইচ গেট নির্মাণ, ▫ সার-বীজ, কৃষি উপকরণ, সেচ, গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম কমানো, ▫ পূর্ব পটিয়ার সবজি চাষিদের ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার ব্যবস্থা করা ও কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন, ▫ কৃষকদের জন্যে আর্মি রেটে রেশন প্রদান, ▫ পটিয়া হেলথ কমপ্লেক্স দিনে ও রাতে প্রতি শিফটে ৪ জন করে মহিলা ডাক্তার নিয়োগ প্রদান, ▫ পটিয়ার স্কুল-কলেজে কৃষক পরিবারের ছেলেমেয়েকে বিনা বেতনে লেখাপড়া করার সুযোগ প্রদান, ▫ পটিয়া পিডিবি ও পল্লিবিদ্যুৎ সমিতির অনিয়ম, গ্রাহকহয়রানি ও ঘুষ বাণিজ্য বন্ধ করাসহ ১০ দফা দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপি প্রদানে উপস্থিত ছিলেন ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য স ম ইউনুচ, আল কাদেরী জয়, পটিয়ার কৃষক নেতা সেলিম উদ্দিন, মুবিনুল হক সাব্বির, রায়হান উদ্দিন, পুলক দাশ, জসীম উদ্দিন জীসু, নাসু মিয়া, অলক চক্রবর্তী, বাদশা মিয়া, আলী আজগর টুসু, স্বপন দে, মোহাম্মদ লোকমান, বাসু দে, সান্টু দে, নুর মোহাম্মদ, আহমদ নুর প্রমুখ ।

স্মারকলিপি প্রদান শেষে থানার মোড়ে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ।

জাতীয় থেকে জেলা নির্বাচন-অবিশ্বাস সর্বত্র?

জাতীয় নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক চলছে। নির্বাচনকালীন সরকারের চরিত্র কী হবে, পুলিশ এবং প্রশাসন কেমন ভূমিকা পালন করবে, ইভিএম ব্যবহার হবে কীভাবে এসব নিয়ে একমত হতে পারছে না রাজনৈতিক দলগুলো। পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচন নিয়ে উত্তেজনা আর অস্থিরতা যেন কমছেই না। গাইবান্ধার উপ নির্বাচনের উত্তেজনা কাটতে না কাটতেই শুরু হয়েছে জেলা পরিষদ নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে অস্থিরতা। নির্বাচন নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর বিরোধী দলবিহীন জেলা পরিষদ নির্বাচনেও বিদ্রোহীদের কাছে পরাজিত হওয়াকে প্রার্থীর জন্য অপমানজনক আর দলের জন্য শৃঙ্খলাভঙ্গ হিসেবে দেখছে ক্ষমতাসীন দল। দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে পার্বত্য তিন জেলা বাদে ৬১ জেলার তফসিল ঘোষণা করেছিল নির্বাচন কমিশন আর আদালতের নিষেধাজ্ঞার কারণে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নোয়াখালীর নির্বাচন স্থগিত করে রাখায় ৫৯ জেলায় নির্বাচন আয়োজন করে নির্বাচন কমিশন। এর মধ্যে ২৫ জেলায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানেরা। বাকি ৩৪টি জেলার মধ্যে ১০টিতে হেরে যায় দলীয় মনোনয়ন প্রাপ্তরা। ২০১৬ সালে ১৯ জন বিজয়ী হয়েছিলেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংস্কৃতি ক্রমশই শক্তিশালী হচ্ছে! অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের ক্ষেত্রে এটি কোন ভালো দৃষ্টান্ত হতে পারে না।

কদিন আগেই খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল গাইবান্ধা-৫ আসনের উপনির্বাচন। এই নির্বাচন যতোটা রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা পালনের কারণে। এই আসনের সংসদ সদস্য ও জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী গত ২৩ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। স্বাভাবিকভাবেই তার মৃত্যুতে আসনটি শূন্য ঘোষণা করা হয়। এরপর তফসিল ঘোষণা এবং সে অনুযায়ী শুরু হয় নির্বাচন আয়োজন। শুরু থেকেই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রার্থীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ নির্বাচন কমিশনে আসতে থাকে। এসব অভিযোগের নিস্পত্তি করার খুব বেশি উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে। ফলে অসন্তোষ, সন্দেহ আর অবিশ্বাস দানা বাঁধতে থাকে ক্রমাগত। জাতীয় নির্বাচনের আর এক বছর বাকি। সার্বিক বিবেচনায় আওয়ামী লীগের জন্য এই নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার খুব গুরুত্বপূর্ণ এমন কোন বিষয় ছিল না। কিন্তু ক্ষমতার দাপট, প্রশাসন আর পুলিশের ভূমিকার ফলে এটা হয়ে উঠলো বহুদিনের জন্য আলোচনার খোরাক।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে গাইবান্ধা-৫ আসনের ভোট পর্যবেক্ষণের মনিটরিং সেলে বসে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করছিলেন। দুপুরবেলা সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল উপস্থিত সাংবাদিকদের জানান, গাইবান্ধা-৫ আসনের উপনির্বাচন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। সিইসি বলেন, 'নিয়ম অনুযায়ী সকাল ৮টায় নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু হয়। নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য আমরা নির্বাচন কমিশন ভবনে একটি পর্যবেক্ষণ কক্ষ করেছি। পর্যবেক্ষণের জন্য আমরা কেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করেছি। আমরা কেন্দ্র থেকে এই নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছি।' কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছেন, 'আমরা দেখেছি, সম্ভবত পোলিং এজেন্ট, তাদের গায়ের গেঞ্জিতে নির্বাচনের প্রতীক ছাপানো ছিল। মেয়েদের একই রকমের শাড়ি নাকি একই রকমের ওড়না ছিল, যেটা নির্বাচন আচরণবিধি পরিপন্থি।'

নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষাপটে মোট ৫০টি ভোটকেন্দ্র বন্ধ করা হয়। এছাড়া রিটার্নিং অফিসারও একটি কেন্দ্রে ভোট বন্ধ করেন। পরে সিইসি বলেন, 'আমাদের কাছে মনে হয়েছে ভোটগ্রহণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। কোনও একটি পক্ষ বা কোনও একটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী প্রভাবিত করতে পারছেন। ফলে আমাদের কাছে মনে হয়েছে ইমপার্শিয়ালি, ফেয়ারলি ভোটগ্রহণ হচ্ছে না।'

তিনি বলেন, '৫১টি কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ বন্ধের পর আইন-কানুন পর্যালোচনা করে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, আরপিওর ৯১ অনুচ্ছেদে যে দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া হয়েছে।' গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'আরপিওর ৯১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কমিশনের কাছে যদি প্রতীয়মান হয় ভোটগ্রহণ সঠিকভাবে হচ্ছে না, ফেয়ারলি হচ্ছে না, তাহলে নির্বাচন কমিশন সব ভোটগ্রহণ বন্ধ করে দিতে পারে। আমরা পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পুরো নির্বাচনি এলাকা গাইবান্ধা-৫-এর ভোট কার্যক্রম আমরা বন্ধ করে দিয়েছি।

দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে ম্লান হাসি মুখে নিয়ে তিনি বলেন, 'আইন ভঙ্গ করে গোপন কক্ষে প্রবেশ করে ভোট দিয়ে দিতে আমরা স্বচক্ষে দেখেছি।' ইভিএম সম্পর্কে তিনি বলেন, 'ইভিএমেরও কোনো ত্রুটি দেখতে পাচ্ছি না। ওই যে মানবিক আচরণ, আরেকজন ঢুকে যাচ্ছে, দেখিয়ে দিচ্ছে। এটা সুশৃঙ্খল নির্বাচনের পরিপন্থি। এরাই ডাকাত, এরাই দুর্বৃত্ত। যারাই আইন মানছেন না তাদেরই আমরা ডাকাত-দুর্বৃত্ত বলতে পারি। কারণ আইনের প্রতি সকলকে শ্রদ্ধা করতে হবে। সকলে যদি আইন না মানি, নির্বাচন কমিশন এখানে বসে সুন্দর নির্বাচন উপহার দিতে পারবে না।'

নির্বাচন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে কেন চলে গেল, এ রকম এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, 'আমরা দেখতে পাচ্ছি, নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে অনেকটা। আমরা দেখতে পাচ্ছি, আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন। গোপন কক্ষে অন্যরা ঢুকছে, ভোট সুশৃঙ্খলভাবে হচ্ছে না। তবে কেন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল, তা আমরা এখনো বলতে পারব না।' হয়তো তিনি দায়িত্ব শেষ করার আগে কখনই সেটা বলতে পারবেন না। আর কেই বা বলবে? ডিসি, এসপি? কয়েকদিন আগেই তারাও তো নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে হৈ চৈ করে তাদের অবস্থান জানান দিয়েছেন। গাইবান্ধা নির্বাচনে তাদের ভূমিকা এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তাঁরা নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা কতটুকু মেনেছেন তা নিয়েও প্রশ্ন আছে। সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদের নির্দেশনা কতটুকু বাস্তবায়িত হলো বা হবে তা নিয়েও সংশয় থেকে গেল। তবে যা হয়েছে তা তো জনগণ দেখেছেন এবং কেউ কেউ ঝুঁকি নিয়ে গণমাধ্যমে বলেছেন। কিন্তু জনগণের এই কথা তো কেউ শুনবে বলে মনে হচ্ছে না।

গাইবান্ধার এই আসনে ইভিএমের মাধ্যমে ১৪৫টি কেন্দ্রে ৯৫২টি বুথে ভোট গ্রহণ করা হয়। নির্বাচনের দিন ভোটারদের নিরাপত্তা দিতে কয়েক প্লাটুন র‍্যাব, আনসার সদস্য ছাড়াও ১ হাজার ২৮৫ জন পুলিশ সদস্য দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু তাঁরা জনগণের ভোটাধিকার রক্ষা করতে পেরেছেন তা দৃশ্যমান হলো না। এই প্রশ্ন উঠা কি স্বাভাবিক নয় যে একটি আসনে উপ-নির্বাচন করতে গিয়ে ইভিএম এর দুর্বলতা, সিসি ক্যামেরার অকার্যকারিতা, প্রশাসনের দায়িত্ব পালনের অনীহা বা অক্ষমতা, পুলিশের ভূমিকা যেভাবে ফুটে উঠলো ৩০০ আসনে নির্বাচন কীভাবে সামাল দেবেন নির্বাচন কমিশন? যদিও ২০০৮ সালের তুলনায় পুলিশ বাহিনীর সদস্য অনেক বেড়েছে, তখন ছিল লাখ খানেক এখন পুলিশ বাহিনীর সদস্য দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ১২ হাজার। কিন্তু গাইবান্ধা ৫ আসনের মতো পুলিশ মোতায়েন করতে হলে পুলিশের প্রয়োজন হবে ৩ লাখ ৮৫ হাজার। দেড় লাখের বেশি পুলিশ পাওয়া যাবে কীভাবে? ভোট কেন্দ্রের মানবিক (!) সহায়তাকারীদের নিয়ন্ত্রণ করা যাবে কীভাবে? প্রতিপক্ষকে হুমকি দিয়ে ভোট কেন্দ্রে আসা বন্ধ করার যে ভীতিকর পরিস্থিতি সেখানে সাধারণ ভোটারদের ভরসা দেয়া যাবে কীভাবে?

অনেকগুলো সন্দেহকে বাস্তবে রূপ দিয়ে গাইবান্ধার নির্বাচন সরকার দলীয় প্রার্থীর দাপট, প্রশাসনের দুর্বলতা আর নির্বাচন কমিশনের অসহায়ত্ব দেখিয়ে দিল। ইভিএম নিয়ে আলোচনার সময় একজন নির্বাচন কমিশনার বলেছিলেন, চ্যালেঞ্জ হলো ঐ লোকটা যে কেন্দ্রের ভিতরে দাঁড়িয়ে থাকে। গাইবান্ধা উপ-নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন সেই চ্যালেঞ্জ আবার দেখা দিল কিন্তু মোকাবিলা করা গেল না। নির্বাচন কমিশন তার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করে নির্বাচন বন্ধ করলেন এতে নির্বাচন কমিশনের দৃঢ় অবস্থানের পরিচয় পাওয়া গেল। কিন্তু ভবিষ্যৎ নির্বাচনের সংশয় তো গেলো না। দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন, পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা, নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলা এসব প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করা সম্ভব হবে কি? গাইবান্ধার শিক্ষা মনে রাখা তাই জরুরি।

যে কোন বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপিত হলে খতিয়ে দেখা বাক্যটা খুবই পছন্দের বাক্য। গাইবান্ধা-৫ আসনের উপ-নির্বাচন নিয়ে কী হয়েছে তা খতিয়ে দেখতেও মাঠ প্রশাসন, ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তাসহ ৬৮৫ জনকে শুনানির আওতায় এনে তদন্ত কার্যক্রম শুরু করেছে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) গঠিত তদন্ত কমিটি। ১৮ অক্টোবর থেকে এই শুনানি শুরু হয়েছে। দেখা যাক! শুনানিতে তাঁরা কী শোনেন আর কি সিদ্ধান্ত নেন।

মানুষ সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে নিজেকে আর তার পছন্দের তালিকায় যে সব জিনিস থাকে তাদের মধ্যে অন্যতম হলো আয়না। কে কবে আয়না বানানোর কৌশল আবিষ্কার করেছিল তা জানা না থাকলেও আয়নার ব্যবহার করতে আপত্তি নেই কারো। এমন মানুষ কি পাওয়া যাবে যিনি আয়নায় নিজেকে দেখতে চান না! আয়নায় মানুষ নিজেকে দেখে। আয়নার সামনে হাসলে হাসির চেহারা, কাঁদলে কান্নার চেহারাই দেখা যায়। আয়না ভুল দেখায় না কিন্তু যে দেখে সে যদি আত্মপ্রেমে মগ্ন থাকে তাহলে নিজেকে সবচেয়ে সুন্দর দেখতে থাকে। কোন খুঁত আর চোখে পড়ে না। মানুষের কাজও না কি আয়নার মতো। যার মধ্যে প্রতিফলিত হয় মানুষের চিন্তা। কিন্তু এক্ষেত্রেও সমস্যাটা একই রকম। নিজের কাজের ভুল বা ত্রুটি দেখতে পায় না এমনকি কাজ নিয়ে কোন সমালোচনা শুনতে চায় না সাধারণ মানুষ। কিন্তু যারা দায়িত্বে থাকেন তাদের তো সাধারণ মানুষের মতো হলে চলবে না। কারণ তাদের ভুল অসংখ্য মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। নির্বাচনের আয়নায় যে চেহারা প্রতিফলিত হলো তা দেখে কি পদক্ষেপ নেবেন ক্ষমতাসীন দল, সেটাই রাজনীতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। জাতীয় নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক এখন তুঙ্গে। এর আগে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন নিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা আর এখন জেলা পরিষদ নির্বাচনের চিত্র দেখা গেল। জনগণের কাছে তাহলে বার্তা কী যাচ্ছে?

শোক সংবাদ

কমরেড জামিলা বুপাশা

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ১০ অক্টোবর সংবাদপত্রে দেয়া এক বিবৃতিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক নেতা কমরেড জামিলা বুপাশার মৃত্যুতে গভীর শোক ও শোকসন্তপ্ত পরিবার এবং স্বজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, তিনি দীর্ঘ ১২ বৎসর ধরে দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৯ অক্টোবর দিবাগত রাত একটায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে বাসদ দলের একজন দরদি বন্ধুকে হারালো।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ ও সাধারণ সম্পাদক শোভন রহমান এক বিবৃতিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক নেতা কমরেড জামিলা বুপাশার মৃত্যুতে গভীর শোক ও শোকসন্তপ্ত পরিবার এবং স্বজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

বীরমুক্তিযোদ্ধা কমরেড শাহাদাত হোসেন

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ৬ অক্টোবর সংবাদপত্রে দেয়া এক বিবৃতিতে বাসদের সদস্য বীরমুক্তিযোদ্ধা কমরেড শাহাদাত হোসেনের মৃত্যুতে গভীর শোক ও শোকসন্তপ্ত পরিবার এবং স্বজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, তিনি তিনি ৬ অক্টোবর ঢাকায় ইবনে সিনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি দলের প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে দল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর মৃত্যুতে বাসদ দলের একজন দরদি বন্ধুকে হারালো।

গার্মেন্টস শ্রমিক অভ্যুত্থান দিবস পালিত

নারায়ণগঞ্জ জেলা শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ

শহিদ আমজাদ হোসেন কামাল স্মরণে এবং গার্মেন্টস শ্রমিক অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জ জেলা শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ৪ নভেম্বর জেলার কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক হাফিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গার্মেন্টস ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় সভাপতি অ্যাড. মন্টু ঘোষ, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি আবু নাঈম খান বিপ্লব, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি হাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি আব্দুল হাই শরীফ, বিপ্লবী শ্রমিক সংহতির কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব আবু হাসান টিপু, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি সেলিম মাহমুদ, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা সাদ প্রমুখ ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ২০০৩ সালের ৩ নভেম্বর ফতুল্লা বিসিকের পেনটেক্স ড্রেস লি.-এর শ্রমিকদের আটঘণ্টা কর্মদিবস, ওভারটাইমে দ্বিগুণ মজুরি, বছরে ২টি উৎসব বোনাসসহ ১৮ দফা দাবির আন্দোলনে পুলিশ গুলি চালিয়ে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের নেতা আমজাদ হোসেন কামালকে হত্যা এবং ২ শতাধিক শ্রমিককে আহত করে। শ্রমিক হত্যায় প্রতিবাদে আন্দোলন বিসিক তথা সারা নারায়ণগঞ্জের গার্মেন্টস শ্রমিক আন্দোলনে রূপ নেয় এবং বিকেএমইএ শ্রমিকদের দাবি মেনে নিয়ে চুক্তি করতে বাধ্য হয়। এরপর থেকে ৩ নভেম্বর দিবসটি গার্মেন্টস শ্রমিক অভ্যুত্থান দিবস হিসাবে পালিত হয়।

নেতৃবৃন্দ যখন-তখন শ্রমিক ছাঁটাই, নির্যাতন, যথাসময়ে বেতন পরিশোধ করা, শ্রম আইন এবং বিধিমালায় শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী ধারাসমূহ বাতিল করে গণতান্ত্রিক শ্রম আইন ও বিধিমালা প্রণয়নের দাবি জানান।

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট জেলা কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

মৌলভীবাজার

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট মৌলভীবাজার জেলা শাখার কাউন্সিল ২১ অক্টোবর সংগঠনের জেলা কার্যালয়ে বাদল দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অ্যাড. মঈনুর রহমান মগনু। সভায় অ্যাড. মঈনুর রহমান মগনুকে সমন্বয়ক করে ৯ সদস্যবিশিষ্ট নতুন কমিটি নির্বাচিত করা হয়।

গৃহবধূ সাথী হত্যার বিচারের দাবিতে বাসদের বিক্ষোভ সমাবেশ

সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম বরিশাল জেলা শাখার সদস্য মোর্শেদা জাহান সাথী হত্যার বিচারের দাবিতে ২ অক্টোবর অশ্বিনী কুমার হল চত্বরে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ ও সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ বরিশাল জেলা শাখার সদস্য দুলাল মল্লিকের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সম্পাদক ইমাম হোসেন খাকন, মহিলা ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক দিলরুবা নূরী, শ্রমিক ফ্রন্ট বরিশাল জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মানিক হাওলাদার প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, পারিবারিক কলহের জেরে গত ২৩ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টায় মোর্শেদা আক্তারকে তার ননদ লুনাসহ ৩ জন মিলে গায়ে কেরাসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই নৃশংস অগ্নিকাণ্ডে মোর্শেদার মুখমণ্ডল, বুক-পেট, শ্বাসনালীসহ শরীরের ৩০% অংশ পুড়ে যায়। ৭ দিন তিনি আইসিইউতে লাইফ সাপোর্টে মৃত্যুর সাথে লড়াই করে গত ৩০ সেপ্টেম্বর মৃত্যু বরণ করেন।

মোর্শেদা আক্তার বিভিন্ন নারী নির্যাতনবিরোধী কর্মসূচিতে অংশ নিতেন। আদালতে পারিবারিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে মামলা করায় তার এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়ার ঘটনা আইনের শাসনের জন্য অত্যন্ত মর্মান্তিক ও ন্যক্কারজনক। ২৩ সেপ্টেম্বর এই ঘটনা ঘটলেও আজ পর্যন্ত আসামি গ্রেপ্তার হয়নি।

নেতৃবৃন্দ মোর্শেদা আক্তারের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানান এবং অবিলম্বে এই ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার জোর দাবি জানান।

সন্ত্রাসীদের মদদদাতা ইডেন কলেজের অধ্যক্ষের অপসারণ দাবি

ছাত্রলীগের অপকর্ম নয়, প্রতিরোধের চিত্রই ইডেন কলেজের প্রকৃত চেতনা

ইডেন কলেজে সিট বাণিজ্য, সন্ত্রাস ও শিক্ষার্থী নির্যাতনের সাথে যুক্ত ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার, বিচার এবং সন্ত্রাসীদের মদদদাতা অধ্যক্ষের অপসারণের দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে ৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুক্তা বাড়ৈর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শোভন রহমানের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা নগর শাখার সভাপতি অনিক কুমার দাস, সহসভাপতি সুস্মিতা মরিয়ম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক সুহাইল আহমেদ শুভ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ, ইডেন কলেজে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের দ্বন্দ্বে যে অপকর্মের কথা প্রকাশ পেয়েছে তাতে সারাদেশের গণতন্ত্রমনা মানুষ বিস্মিত হয়েছে। স্বাধীনতার ৫১ বছর পরে এসেও দেশের অন্যতম প্রধান একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এরকম দখলদারীত্বের ঘটনা ঘটতে পারে যা অকল্পনীয়। ইডেন কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে আত্মত্যাগকারী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। ইডেন কলেজের শিক্ষার্থীরাই ভাষা আন্দোলনের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রতিরোধের স্পর্ধায় নির্মাণ করেছিল শহিদ মিনার। ইডেন কলেজের সেই সংগ্রামী চেতনায় আজ কালি লেপনের মতো জঘন্য অপরাধ করেছে ছাত্রলীগ। আর এতকিছু হবার পরও এই সন্ত্রাসীদের পক্ষ হয়ে সাফাই গাইছেন ইডেন কলেজের অধ্যক্ষ। আমরা এই নতজানু দলদাস সন্ত্রাসীদের মদদদাতা অধ্যক্ষের অপসারণ দাবি করছি।

নেতবৃন্দ আরও বলেন, শুধু ইডেন কলেজেই নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও তারা ঘোষণা দিয়ে ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের উপর হামলে পড়েছে। ঢা.বি. উপাচার্য জেনে শুনেও এই হামলা প্রতিরোধে কোন ব্যবস্থা নেননি। আমরা তারও নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।

সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফেরাম কিশোরগঞ্জ জেলা কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার কাউন্সিল ২০ অক্টোবর জেলা বাসদ কার্যালয় অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক দিলরুবা নূরী, বাসদ জেলা সমন্বক অ্যাড. শফিকুল ইসলাম ও মহিলা ফোরামের জেলা নেতৃবৃন্দ। কাউন্সিলে ইসপিতা শবনমকে সভাপতি ও রুপালী খাতুনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট নতুন কমিটি নির্বাচিত করা হয়।

বিপ্লবের জন্য উৎপাদন পদ্ধতি ও রাষ্ট্র চরিত্র নির্ণয় এবং সঠিক রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণ জরুরি

[২৯ ও ৩০ জুলাই '২২ বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের ৬ নং জোনের দুই দিনব্যাপী শিক্ষা শিবির আলী আহাম্মদ চুনকা পাঠাগার, নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা শিবিরের বিষয় ছিল বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি ও রাষ্ট্র চরিত্র। সেই শিক্ষাশিবিরে বাসদ সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের বক্তব্য ঈষৎ সম্পাদনা করে প্রকাশ করা হল।]

উৎপাদন পদ্ধতি ও রাষ্ট্র চরিত্র জানা প্রয়োজন কেন? আমাদের দল বাসদ বাংলাদেশে সমাজ বিপ্লব করতে চায়, সেই বিপ্লবের জন্য যে রণনীতি ও রণকৌশল ঘোষণা করেছে, সেটা দল প্রকাশিত উৎপাদন পদ্ধতি ও রাষ্ট্রচরিত্র বইটিতে আছে। আমরা বলেছি রাষ্ট্রটা পুঁজিবাদী, বিপ্লবের স্তর হবে সমাজতান্ত্রিক। বুর্জোয়া শ্রেণিকে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করে সর্বহারা শ্রেণি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবে। গ্রাম-শহরের শ্রমজীবী মানুষের দৃঢ় মৈত্রীর ভিত্তিতে বিপ্লবের দোলায়মান মিত্র হিসেবে উদার গণতন্ত্রী ও সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক শক্তিকে সাথে নিয়ে এগোতে হবে। এভাবে আমরা বিপ্লবটা সম্পন্ন করতে চাই। কালের বিবর্তনে সংগ্রামের রূপ পাল্টাবে চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের আগে পর্যন্ত। তাই প্রকৃত মুক্তি অর্জনের সংগ্রাম গড়ে তুলতে হলে সর্বপ্রথম দরকার নির্দিষ্ট সময়ের শোষণের স্বরূপ এবং তার শ্রেণি ভিত্তিটি জানা। যে কোন বিপ্লবের বিজয়ের জন্য দরকার আর্থ সামাজিক পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণ এবং বিরাজমান পরিস্থিতিতে শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করা অর্থাৎ বিপ্লবী লড়াইয়ে রাজনৈতিক সংগ্রামের সঠিক লাইন নির্ধারণ করার প্রশ্নটিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ লড়াই যতই হোক সঠিক রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে যথার্থ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলের নেতৃত্বে তা পরিচালিত না হলে, জনগণের সংগ্রাম কখনই তার ঈপ্সিত মুক্তি তথা বিপ্লবী লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। এক কথায় বলতে গেলে দেশে বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণের প্রশ্ন। দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উৎপাদন পদ্ধতি ও তার নিরিখে শ্রেণিবিন্যাসকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী বিজ্ঞানের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে রাষ্ট্রচরিত্র নির্ধারণ করতে হবে। বিপ্লবের স্তর নির্ধারণের প্রশ্নেও রাজনৈতিক দিক থেকে শ্রেণিবিন্যাসকে সমান গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করতে হবে। কারণ আমরা সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে চাই। আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লাইন আমরা নির্ধারণ করেছি,অন্যান্য বামপন্থি দলগুলো বিশেষত, ট্রেডিশনাল কমিউনিস্ট পার্টি, পিকিং ও মস্কোপন্থি পার্টি-তারা সবাই বিপ্লবের ভিন্ন ভিন্ন স্তর নির্ধারণ করেছে। কেউ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব, বিপ্লবী গণতান্ত্রিক রূপান্তর-যেটা বাস্তবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, কেউ নির্ধারণ করেছে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, এটাকে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবও বলা হয়। বিপ্লবের লাইন নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমাজটা কেমন, রাষ্ট্রের চরিত্র কেমন তার উপর নির্ভর করেই বিপ্লবের স্তর নির্ধারিত হয়। সামন্তবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের লক্ষ্যে বুর্জোয়াশ্রেণি সামন্ত-রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে বিপ্লব করেছিল তার নাম বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। যেমন, ইংল্যান্ডের ক্রমওয়েল বিপ্লব, ফরাসি বিপ্লব, জাপানের মেইজি বিপ্লব ইত্যাদি। কিন্তু ইতিমধ্যে যখন বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রক্ষমতায় বসে সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করে, অন্যদেশ দখল করছে, তখন সেই দেশসমূহের বুর্জোয়াশ্রেণি সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে জাতীয় মুক্তি বা স্বাধীনতা এবং সামন্তবাদ উচ্ছেদ করে স্বাধীন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যে বিপ্লব করেছে তাকে বলা যায় জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব। যেমন, আমেরিকা, আলজেরিয়া, ভারত, বাংলাদেশ ইত্যাদি। কমরেড লেনিন দেখিয়েছেন, সাম্রাজ্যবাদের যুগে বুর্জোয়াশ্রেণির নেতৃত্বে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব কিংবা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব কোনটাই পূর্ণতা পেতে পারে না। তাই বিপ্লব হবে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে এই বিপ্লবের নাম হবে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। যেভাবে চীনে মাও সেতুং নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক বিপ্লবটা শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে হবে। পুঁজিবাদের অবক্ষয়ের এইকালে এ দায়িত্ব শ্রমিকশ্রেণিকে নিতে হবে, সেখান থেকে আসছে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব বা নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। চীনের যে বাস্তবতা ছিল সেখানে একটা অংশ ছিল জাপান-মার্কিনসহ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদীদের দখলে, অন্য এলাকায় চলেছে সামন্ত প্রভু জমিদারদের শাসন, ফলে শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী শক্তির নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ দুটাকে উৎখাত করে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে হবে। এখানে শ্রমিকশ্রেণি রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসম্পূর্ণ কাজগুলো সম্পূর্ণ করে সমাজতন্ত্র কায়েম করবে। আবার রাশিয়ায় যে বিপ্লব হয়েছে সেটা ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। কারণ, রাশিয়ায় সামন্ত জার সরকারকে উচ্ছেদ করে ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বুর্জোয়া সরকার ক্ষমতায় আরোহণের পর ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণি রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে। এই সকল ধরনের বিপ্লবের মধ্যে কতগুলো পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্যগুলো নির্ণয়ের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের চরিত্র বোঝাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর সেই জন্যই আমরা উৎপাদন পদ্ধতি ও রাষ্ট্র চরিত্র বিষয়ে আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। আমাদের প্রতিদিনের আন্দোলনের দাবি-কর্মসূচি নির্ধারণ, শত্রু-মিত্র যাচাই করা ইত্যাদির জন্য যেমন এই আলোচনা বোঝা জরুরি আবার অন্যদিকে বিভিন্ন পার্টির সাথে মতবাদিক সংগ্রামের জন্যও এটা বোঝা জরুরি। ইতিপূর্বে অন্যান্য পার্টিগুলো আমাদের দলের বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ নিয়ে অনেক সমালোচনা করেছে বিভিন্ন সময়ে। অনেকে বলেছে আমরা এক লাফে গোড়া থেকে গাছের মাথায় উঠতে চাই, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করতে হলে যে ঐতিহ্যগত ধারণা আছে, যে বুর্জোয়াশ্রেণির অর্থাৎ পুঁজির বিকাশ ঘটাতে হবে এবং একটা ক্লাসিকাল সর্বহারা শ্রেণির বিকাশ ঘটাতে হবে, এরপরেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে হবে।

এই বিতর্ক রাশিয়াতেও ছিল। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়াতে জার সরকার উৎখাতের পর বুর্জোয়া ও জমিদারদের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত কেরেনেস্কির সরকার ক্ষমতায় বসে। যার মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছিল। বিপ্লবের এই লড়াইয়ে বলশেভিক, মেনশেভিক ও অন্যান্য সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক দলগুলোও ছিল। মেনশেভিক তো বটেই বলশেভিক পার্টির মধ্যেও তখন বিতর্ক ছিল যে সামন্ত প্রভুদের উচ্ছেদ করে বুর্জোয়ারা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেছে। এখন বুর্জোয়াশ্রেণিকে পুঁজি এবং শিল্প কলকারখানার বিকাশ সাধন করতে হবে। তাই বুর্জোয়া সরকারকে আমাদের সহযোগিতা করতে হবে। এই ধরনের চিন্তা যখন চলছে তখন লেনিন দেশের বাইরে ছিলেন। তিনি রাশিয়ায় এপ্রিল মাসে ফেরার পথে ফিনল্যান্ড সীমান্তে বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতায় তিনি বলেন, এখন আমাদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করতে হবে। বুর্জোয়া কেরেনেস্কি সরকারকে সহযোগিতা বা তার সাথে কাজ করা নয় বরং বুর্জোয়া শ্রেণির হাত থেকে রাষ্ট্র ক্ষমতা শ্রমিক শ্রেণি তথা সোভিয়েতের হাতে নিয়ে আসতে হবে। এরপর বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায়ও ঐ বিষয়ে আলোচনা হয় যেটা তার বিখ্যাত 'এপ্রিল থিসিস' হিসেবে পরিচিত। এখানেই লেনিন আলোচনা করেছেন, বলশেভিকদের লক্ষ্য কী হবে, রণনীতি-রণকৌশল কী হবে? তিনি বলেন, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আগে রাষ্ট্র ক্ষমতা পুরোনো শ্রেণির হাতে ছিল, অর্থাৎ নিকোলাস রোমানভের রাজত্বে অভিজাত সামন্ত ভূস্বামী শ্রেণির হাতে। বিপ্লবের পরে রাষ্ট্র ক্ষমতা অন্য শ্রেণির হাতে, নতুন শ্রেণি অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণির হাতে গিয়েছে। এক শ্রেণির হাত থেকে রাষ্ট্র ক্ষমতা অন্য শ্রেণির হাতে যাওয়া হচ্ছে বিপ্লবের প্রথম, মুখ্য এবং মৌলিক লক্ষণ। বিপ্লবের যথার্থ বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা-দুই অর্থেই। ততদূর পর্যন্ত রাশিয়ায় বুর্জোয়া বা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে। বলশেভিকদের একটা অংশ মনে করতেন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য পুঁজিবাদ সে মাত্রায় বিকশিত ও সে স্তরে উন্নীত হয়নি। তা ছাড়া বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব শেষ হলেও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের করণীয় অনেক কাজ এখনো বাকি আছে। তাদের যুক্তি ছিল এইসব অপূরিত কাজ সমাপ্ত না করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কীভাবে সম্ভব অর্থাৎ তাদের দ্বিধা তখনও কাটেনি। তাদের প্রশ্নের মীমাংসা হয় লেনিন নির্দেশিত এপ্রিল থিসিসের মাধ্যমে। এই বিষয়টা স্পষ্ট করতে লেনিন বললেন, প্রত্যেক বিপ্লবের মৌলিক প্রশ্ন হলো রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল। এই প্রশ্ন না বুঝলে বিপ্লবে বুদ্ধিমত্তার সাথে অংশগ্রহণ হতে পারে না, নেতৃত্ব দেওয়ার কথা তো বলাই চলে না। তখন বলা হয়েছে বিপ্লবের স্তর নির্ধারিত হয় শাসন ক্ষমতায় কোন শ্রেণি আছে প্রধানত তাদের চরিত্র দিয়ে। বিপ্লবের স্তর নির্ধারণের প্রশ্নে মার্কস এর যে ক্লাসিকাল ব্যাখ্যা, বুর্জোয়ার বিকাশ ঘটাতে হবে, শিল্প কারখানার বিকাশ ঘটাতে হবে, শ্রেণি হিসেবে প্রলেতারিয়েতের বিকাশ ঘটাতে হবে এবং একটা পর্যায়ে গেলে যে বিশেষ পরিস্থিতি তৈরি হবে তখন সেটাকে কাজে লাগিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে। লেনিন এখানে তার বক্তব্য উপস্থাপিত করে বলেন, 'বিপ্লবের প্রথম স্তরে বুর্জোয়াশ্রেণির হাতে ক্ষমতা আসে, সেখান হতে দ্বিতীয় স্তরে নিশ্চিতভাবেই সর্বহারাশ্রেণি ও দরিদ্রতম কৃষকদের হাতে ক্ষমতা আসবে'-এই উত্তরণ সংঘটিত করাই পার্টির কাজ। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি চালানোই পার্টির কর্মনীতি। এমনকি ১৯০৫ সালে 'গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল ডেমোক্রেসির দুই কৌশল' শীর্ষক পুস্তিকায় লেনিন বলেছিলেন যে, জারতন্ত্র নিপাত ঘটাবার পর সর্বহারাশ্রেণি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের জন্য অগ্রসর হবে। যেটাকে আরও বিবৃত করে বলেছেন, 'সর্বহারা বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউটস্কি' পুস্তিকায়। রুশ বিপ্লবের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন—'আমরা যা বলেছিলাম তাই সত্যি হয়েছে। বিপ্লবের গতি আমাদের যুক্তির নির্ভুলতা প্রমাণ করে দিয়েছে। প্রথমে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, জমিদারদের বিরুদ্ধে আর মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে 'সমগ্র' কৃষকসমাজকে সঙ্গে নিয়ে (এবং সে পর্যন্ত বিপ্লব বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলে গণ্য হবে); তার পরে গরিব কৃষক আর আধা-শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়ে, সমস্ত শোষিত জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে, গ্রামের ধনী কৃষক আর মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে এগোতে হবে; এবং এই অবস্থায় বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হবে। প্রথম আর দ্বিতীয় বিপ্লবের মধ্যে কোনো কৃত্রিম চীনের প্রাচীর খাড়া করার চেষ্টা করা; শ্রমিকশ্রেণির প্রস্তুতির পরিমাণ, গরিব কৃষকদের সঙ্গে তাঁদের ঐক্যের পরিমাণ ছাড়া অন্য কোনো দিক দিয়ে দুই বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা টানার চেষ্টা করার অর্থ মার্কসবাদকে জঘন্যভাবে বিকৃত করা, তার জায়গায় উদারনীতিবাদকে স্থান দেয়া'। (লেনিন, নির্বাচিত রচনাবলি, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ১৯১)

আপাত অর্থে বিপরীত মনে হলেও এটা বিপরীত ছিল না। মার্কসের সময় পুঁজি অবাধ প্রতিযোগিতার স্তরে ছিল। পরবর্তীতে লেনিন দেখান যে, পুঁজিবাদ প্রতিযোগিতামূলক স্তর অতিক্রম করে একচেটিয়া পুঁজির জন্ম দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে। পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজির যুগে প্রবেশ করে ব্যাংক পুঁজি ও শিল্প পুঁজির মিলনের মধ্য দিয়ে লগ্নি পুঁজির জন্ম দিয়েছে। পণ্য রপ্তানির স্থলে পুঁজি রপ্তানি করাই সাম্রাজ্যবাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়, লেনিন কর্তৃক পরিবর্তনের এ ব্যাখ্যা মার্কসবাদী বিজ্ঞানের একটা মৌলিক বিকশিত ধারণা। আবার দেশে দেশে বিপ্লব ও বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদী বিজ্ঞান বিপ্লব সম্পর্কিত ধারণা নতুন নতুন পরিস্থিতিতে পড়ে মৌলিক না হলেও সংযোজন ঘটিয়ে চলেছে। তখনকার পরিস্থিতিকে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করে লেনিন তার বক্তব্য উপস্থিত করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ডাক দিলেন। আরেকটি প্রবন্ধে তিনি দেখালেন যারা শুধুমাত্র বুর্জোয়া বা পুঁজির বিকাশ ঘটাতে হবে, কী মাত্রায় পুঁজির বিকাশ ঘটল, শিল্প কতখানি বিকশিত হল বা সর্বহারা শ্রেণি, শ্রেণি হিসেবে কতখানি সংগঠিত ও বিকশিত হলো এর উপর নির্ভর করে যারা বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ করতে চান তারা অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদের সংকটে ভোগেন। তখন তিনি তার প্রবন্ধ লিখলেন 'মার্কসবাদ অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদ নয়'। যখন আমরা আমাদের দেশের বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ করব, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করব তখন এই বিষয়গুলো আমাদের আরও ভালো করে পড়া এবং জানা-বুঝা দরকার।

পুঁজিবাদের বিকাশ কি মাত্রায় হলে তার চূড়ান্ত বিকাশ বলে মনে করা হবে? পুঁজিবাদের অসম বিকাশের কারণে সব জায়গায় সমানভাবে বিকাশ হবে না। আবার সকল দেশে একই প্রক্রিয়াতেও হয় নাই। মার্কস বলেছিলেন উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে বিপ্লব আগে হবে এবং কয়েকটি দেশ মিলে একসাথে বিপ্লব হবে। এটাকে ধরে ট্রটস্কি পরে হাজির করল বিশ্ব বিপ্লবের তত্ত্ব। আমরা যখন আমাদের দলের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের বিপ্লবের স্তর সমাজতান্ত্রিক বলেছিলাম, তখন আমাদেরকে অনেকে ট্রটস্কিবাদী বলল। ট্রটস্কি বলেছিল সারা দুনিয়ায় সকল দেশে বিপ্লবের একটাই মাত্র স্তর সেটা হলো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

উৎপাদন পদ্ধতি এবং রাষ্ট্র চরিত্র আলোচনা করতে গেলে প্রথমে আমাদের আলোচনা করতে হবে উৎপাদন কি? মানুষের জীবন নির্বাহের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সেটা সৃষ্টি করাই হচ্ছে উৎপাদন। অর্থাৎ উৎপাদন হচ্ছে উপযোগ সৃষ্টি করা, যা মানুষের কোন না কোন অভাব পূরণে সক্ষম। এটা হয় শ্রম প্রয়োগে বস্তুর অসংখ্য রূপান্তরের মাধ্যমে। মানুষের জীবনধারণের জন্য চাই বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী। প্রাকৃতিক বস্তু বা প্রকৃতি থেকে আহরিত বস্তুর উপর বিভিন্ন হাল-হাতিয়ারের সাহায্যে মানুষের শ্রম প্রয়োগ করে দ্রব্য সামগ্রী তৈরি করার প্রক্রিয়ার নামই উৎপাদন। প্রকৃতিতে

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

কর্নেল তাহের : সমাজ বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর এক লড়াকু জীবন

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

হওয়ার কথা এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দেয়ার কথা। তখন তারা খেয়াল করে নাই, মিটিং হবে বিকালে। তখন সেক্রেটারিয়েট তো বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে স্মারকলিপি দেবে কীভাবে? তখন বিপুল জনসমাগমের উত্তেজনায় ও অস্থিরতায় ভুগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবনে স্মারকলিপি দিতে মিছিল শুরু হলো। আর এতে ক্ষমতাসীনরা বলার সুযোগ পেয়েছে যে মন্ত্রীপাড়ায় জাসদ আক্রমণ করতে আসছে, তখন গুলি চালিয়ে কেউ বলে দশজন, কেউ বলে বিশজন মানুষকে হত্যা করা করা হলো। কিন্তু সমস্যাটা কোথায় হলো? এই যে জাসদের উপর নির্মম অত্যাচার নেমে আসলো, জাসদের করণীয় ছিলো কী? তখন উচিৎ ছিলো যুক্তফ্রন্ট গঠন করে ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা। মওলানা ভাসানীর মতো একজন মানুষ তখন দেশে ছিলেন। তাঁকে সামনে রেখে সমস্ত বামপন্থি দলগুলোকে নিয়ে যদি জাসদ সেদিন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতো, তাহলে ১৫ আগস্টে সামরিক অভ্যুত্থান না হয়ে গণ-অভ্যুত্থান হতে পারতো। হয়নি। কিন্তু জাসদ সেটা না করে কী করলো? গণবাহিনী গঠন করলো। অর্থাৎ সশস্ত্র রক্ষীবাহিনী আর আওয়ামী বাহিনীকে আমরা সশস্ত্রভাবে মোকাবিলা করবো। এটা ছিলো ভুল সিদ্ধান্ত। এর ফলে জাসদ শাসকদের আক্রমণের মুখে পড়লো, আবার জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া শুরু হলো।

এই জায়গা থেকে শুরু করলে ৭ নভেম্বরের ব্যর্থতার কারণ ধরা যাবে। রাশিয়ায় ১৯০৫ সালে বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। পরিস্থিতি ছিলো বিপ্লবের পক্ষে, কিন্তু প্রস্তুতি ছিলো না। প্রস্তুতি না থাকার ফলে শোষকদের আক্রমণে বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। ঐ শিক্ষা নিয়ে কমরেড লেনিন ১৯১৭ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করলেন। কেন একটা সফল হয়েছিলো, কেন আরেকটা ব্যর্থ হয়েছিলো, এগুলো আপনারা রুশ বিপ্লবের ইতিহাস পড়লে জানতে পারবেন। এক, দুই, তিন, চার করে সব ব্যাখ্যা করা আছে। তাহলে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর যখন একটা পরিস্থিতি তৈরি হলো, অবজেক্টিভ কন্ডিশন অর্থাৎ বাস্তব অবস্থা একটা বড় পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, সামরিক বাহিনীর মধ্যে সংগঠিত সৈনিক সংস্থা একটা আক্রমণে নামলো, সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কৃষক, ছাত্র, জনতা যদি রাজপথে নেমে যেত, যেটা রাশিয়াতে হয়েছিলো, তাহলে ঐ বিপ্লব ব্যর্থ হতো না, সফল হয়ে যেতো। ক্যান্টনমেন্ট হচ্ছে বুর্জোয়াদের ক্ষমতা ও নিরাপত্তার কেন্দ্রভূমি। কাজেই একে ভাঙার জন্য সঠিক ভাবেই সৈনিক সংস্থা আঘাত করেছিলো। কিন্তু এটা টিকলো না, কেননা এর সমর্থনে বিশাল জনবাহিনী ছিলো না। যেটা ছিলো ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবে। তাহলে এই পুরো দায় কি কর্নেল তাহেরকে দেওয়া যাবে? কিছু দায়িত্ব অবশ্য তাঁর থাকলেও ব্যর্থতার প্রকৃত ইতিহাস আমাদের বিপ্লবীদের খুঁজে বের করতে হবে।

প্রতিটি গণ-আন্দোলনই আগামী দিনের বিপ্লবী অভ্যুত্থানের শিক্ষা রেখে যায়

কোনো দেশে বিপ্লব করতে চাইলে সেই দেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাস, তার বড় বড় যে সমস্ত ঘটনা, সফলতা, ব্যর্থতার ইতিহাসগুলি জানতে হবে এবং বিশ্লেষণ করতে হবে। আমাদের দেশে বিপ্লব করতে হলে ৫২-র ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের শিক্ষা তো আছেই, ৫৪-র যুক্তফ্রন্ট আন্দোলন, নির্বাচন এবং তারপরে ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার পরে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সিপাহী জনতার অভ্যুত্থান এবং ১৯৯০ সালের গণ-অভ্যুত্থান—এই শিক্ষাগুলো লাগবে। স্বাধীনতা পূর্বকালে যেমন, শ্রমিকদের ঘেরাও আন্দোলন করেছিলেন মওলানা ভাসানী। অসংখ্য কৃষক সমাবেশ করেছিলেন, গ্রাম পর্যায়ে আন্দোলনের বিস্তার ঘটাতে হাট হরতাল করেছিলেন—সেগুলোর কথা মনে রাখতে হবে। মওলানা ভাসানী সঠিক কর্মসূচি নিয়েছিলেন, কিন্তু কমিউনিস্টরা—কমিউনিস্ট পার্টিগুলো তাঁর পেছনে সেভাবে দাঁড়ায়নি, বা সেই অবস্থা তখন তাদের ছিলো না। সেজন্য তিনি পারেননি। আন্দোলন আওয়ামী লীগের হাতে চলে গিয়েছিলো। তারপর এমনকি আওয়ামী লীগের কাছ থেকেও শিক্ষা নেওয়া যায়, বিশেষ করে যখন শেখ মুজিব অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়। অর্থাৎ জনগণের কাছ থেকে ট্যাক্স নিয়ে জনগণকেই অত্যাচার করে যে শোষক শ্রেণি, তারা যাতে ঐ ট্যাক্স আর না নিতে পারে, তার জন্য জনমত সংগঠিত জনশক্তিতে জমাট বাঁধলো। কিন্তু সেটা তো তারা ধরে রাখতে পারবে না কারণ ক্ষমতাকেন্দ্রিক বিরোধে তাদের আপসের পথেই হাঁটতে হবে। মুক্তির সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম বলেই আপস আলোচনা চলছিল। বানের ঢল যেমন করে বাঁধ ভেঙে ভাসিয়ে নেয় তেমনি জনগণের মুক্তির আকুতি আপসের দেয়াল চূর্ণ করে দিয়েছিলো। কিন্তু সামনে বিকল্প নেতৃত্ব আসতে পারল না। তারাই নেতৃত্বে থেকে গেলেন। জনযুদ্ধ শুরু হলো। এক্ষেত্রে কর্নেল তাহেরের শিক্ষাটা লাগবে, যে আমরা দেশের ভিতরে থেকে কেন এই যুদ্ধটা পরিচালনা করি নাই বা করতে পারলাম না? এক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারী শক্তি আর সহকারী বিদেশি শক্তির শ্রেণিগত অবস্থান থেকে তাকে বুঝতে হবে।

ষড়যন্ত্র নয় গণ-অভ্যুত্থানের পথেই হাঁটতে চেয়েছিলেন তাহের

অনেকে বলে যে, পনেরোই আগস্টে শেখ মুজিবের সপরিবারে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সাথে কর্নেল তাহেরের সম্পর্ক ছিলো। এটা অনৈতিহাসিক এবং মনগড়া। কর্নেল তাহের সামরিক অভ্যুত্থানের পক্ষে ছিলেন না। তবে তিনি গণ-অভ্যুত্থানের পক্ষে ছিলেন। আওয়ামী লীগের যে একদলীয় শাসন, এই শাসন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থি এবং এটা একটা নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা। এটাকে সামরিক বাহিনী দিয়ে নয়, জনগণের আন্দোলনের মাধ্যমেই উচ্ছেদ করা সম্ভব। এবং সেই সময়ের আওয়ামী লীগ বা পনেরোই আগস্টে নিহত শেখ মুজিবের শাসন সম্পর্কে তার একটা সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন আছে সামরিক আদালতে প্রদত্ত জবানবন্দিতে। সেখানে তিনি বলছেন, '১৯৭৫ সালের পনেরোই আগস্ট পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকার কী ভূমিকা পালন করেছে, তা দেশবাসী সবারই জানা। কীভাবে একের পর এক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করা হয়েছিলো এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে হত্যা করা হয়েছিলো এখন তা দলিলের বিষয়। এক কথায় বলা যায়, আমাদের লালিত সব স্বপ্ন, আদর্শ, মূল্যবোধকে একের পর এক ধ্বংস করা হচ্ছিল। গণতন্ত্রের অসম্মানজনক কবরশয্যা রচিত হয়েছিলো। মানুষের অধিকার মাটি চাপা পড়েছিল। আর সারা জাতির উপর চেপে বসেছিলো একটা ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্র। ফ্যাসিবাদী নির্যাতনের গর্ভে ধীরে ধীরে জন্ম নিলো ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণপ্রতিরোধ আন্দোলন। এটা খুবই দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক যে, এ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা নেতাদের অন্যতম প্রধান পুরুষ শেখ মুজিবুর রহমান শেষ পর্যন্ত একনায়কে পরিণত হয়েছিলেন। অথচ মুজিব তার সংঘাতময় রাজনৈতিক জীবনে কখনোই স্বৈরতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্রের সঙ্গে আপস করেননি। তিনি ছিলেন এককালে আমাদের গণতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতীক। অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও তিনিই ছিলেন একমাত্র নেতা যে জনগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। জনগণের মাঝে তার ব্যাপক ভিত্তি ছিলো। প্রতিদানে জনগণ তাকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করেছিলো। জনগণই মুজিবকে সম্মান এনে দিয়েছিলো, বহুগুণ করে তাকে নায়কের প্রতিমূর্তি দিয়েছিলো। আসলে জনগণ তাদের নেতা হিসেবে মুজিবকে তাঁদের মনমতো করে গড়ে নিয়েছিলো। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুজিব নামটি ছিলো জনগণের হুঙ্কার। মুজিব ছিলেন জনগণের নেতা। একথা অস্বীকার করার অর্থ সত্যকে অস্বীকার করা। তাই চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তার ভাগ্য নির্ধারণ করার অধিকার শুধু জনগণেরই ছিলো। যে মুজিব জনগণকে প্রতারিত করে একনায়ক হয়ে উঠেছিলেন তাকে জনগণের শক্তি দিয়ে মোকাবিলা করাটাই হতো সবথেকে ভালো। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, যে জনতা মুজিবকে নেতার আসনে বসিয়েছিলো, সেই জনতাই একদিন মুজিবকে উৎখাত করতো। ষড়যন্ত্র আর চক্রান্ত করার অধিকার তারা কাউকে দেয় নাই (সামরিক আদালতে প্রদত্ত কর্নেল তাহেরের জবানবন্দি; অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ, কর্নেল তাহের ও জাসদ রাজনীতি; আলতাফ পারভেজ, পৃ. ২২৭)।' আজকে জাসদ কি কর্নেল তাহেরের এই বিশ্লেষণকে সঠিক মনে করে? কর্নেল তাহের এক বুর্জোয়াকে ক্ষমতাচ্যুত করে আরেক বুর্জোয়াকে ক্ষমতায় বসানোর রাজনীতি করেন নাই। সিরাজ সিকদারও করেন নাই। কিন্তু সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর পর তার পরিবার এবং সমর্থকদের অনেকে হলো বিএনপি আর কর্নেল তাহেরের মৃত্যুর পর তার পরিবারের এবং অনুসারীদের অনেকেই হলো আওয়ামী লীগ। কর্নেল তাহের তো এই রাজনীতি করেন নাই। তিনি শোষক শ্রেণির উৎখাত করতে চেয়েছিলেন। স্বাধীনতার পরে যদি কর্নেল তাহের এই উদ্যোগ নিতেন, তাহলে সিরাজ সিকদারের পরিণতি পেতেন আর সিরাজ সিকদার যদি বিএনপি-র আমলে উদ্যোগ নিতেন তাহলে কর্নেল তাহেরের পরিণতি বরণ করতেন। শ্রেণির এই বিষয়টা আমাদের একটু মাথায় রাখা দরকার।

জাসদ রাজনীতির ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েই গড় ওঠে বাসদ

কর্নেল তাহেরের অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার মধ্যে যে ভুল, এটা জাসদ রাজনীতির ভুলের অংশ। জাসদ রাজনীতির সূচনাকাল থেকে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অমিমাংসিত ভুলের ভুল উপলব্ধি জমে জমে পাহাড়সম বাধা তৈরি করেছিল যার খেসারত অনেক কঠিন মূল্যে দিতে হয়েছে। আমাদেরও অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল, তারপরেও যতটুকু বুঝেছিলাম ততটুকু সংগ্রাম আমরা করেছি। এক পর্যায়ে আমরা জাসদের রাজনীতি ত্যাগ করে কেনো বাসদ করলাম, তার যৌক্তিকতা দিনে দিনে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। কারণ জাসদের কোন অংশই আজ আর জাসদ এর জন্মকালীন ঘোষণা কিংবা অঙ্গীকার কোনটারই অবশিষ্ট রাখেনি। আমরা শিক্ষা নিয়ে অটল থাকার চেষ্টা করেছি। কর্নেল তাহের যে সমস্ত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, সেটা বিপ্লবের জন্যই ছিলো। তবে যে ভুলটা হয়েছিলো, সেই ভুল থেকে শিক্ষা না নিয়ে এখানে ভবিষ্যৎ বিপ্লব প্রচেষ্টা সফল করা যাবে না।

ফাঁসির মঞ্চে শান্ত এবং অবিচল তাহের শিক্ষা দিয়ে গেলেন কীভাবে মরতে হয়

আমরা ক্ষুদিরামের কথা শুনেছি, সূর্যসেনের কথা শুনেছি। কীভাবে নিংশঙ্ক চিত্তে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একজন বিপ্লবী ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়েও স্পর্ধিত থাকতে পারেন, সে ইতিহাসের কথা আমরা শুনেছি। সেইরকম এক মহান বিপ্লবী চরিত্র কর্নেল তাহের। উনি যখন গ্রেপ্তার হন, আমি তখন ঢাকায়, কেন্দ্রীয় কারাগারে। ওনার যখন ফাঁসি হয়, আমাকে তখন বদলি করা হয়েছিলো চট্টগ্রাম জেলখানায়। সাধারণত ফাঁসির আসামিদের অনেক টানা হেঁচড়া করে মঞ্চে নিতে হয়। উনি ফাঁসির দিন একদম শান্তভাবে মওলানাকে বললেন, 'তুমি জিয়াকে কলমা পড়াও। অপরাধ করলে জিয়া করছে। আমি কোনো অপরাধ, অন্যায় করি নাই। আমাকে কলমা পড়ানোর দরকার নাই।' এসব দেখে কারারক্ষীরা তো অবাক হবেই। উনি শান্ত স্বাভাবিকভাবে গোসল করলেন, জেলে একটা জামা গিফট পেয়েছিলেন, সেটা পড়লেন। আম কেটে খেলেন, গার্ডসহ অন্যান্যদের খাওয়ালেন। এরপর চা-সিগারেট খেয়ে বললেন আমি রেডি, আমাকে ধরার দরকার নাই। সেই খোঁড়া পা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি ফাঁসি মঞ্চে গেলেন। ফলে, সারাজীবন লড়াইয়ের মধ্যে যেমন বিপ্লবী চরিত্রের স্বাক্ষর রেখেছেন তেমনি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও জীবনকে অসম্মানিত করেন নাই। একজন বিপ্লবীর চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করেন নাই। যুগ যুগ ধরে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে রইলেন বিপ্লবীদের জন্য। এতো বিশাল এক মহাপ্রাণ। তাঁকে আমরা হারিয়েছি।

কর্নেল তাহেরের স্বপ্ন ও সংগ্রামকে ধারণ করেই আগামী দিনের বিপ্লবীদের পথ রচনা করতে হবে

যখন শুরুতে আমরা এই আলোচনাগুলো করেছিলাম, অনেকেই বলেছিলেন ৭ নভেম্বর তো ব্যর্থ। আমরা বলেছি যে, এই ব্যর্থতা থেকেই শিক্ষা নিতে হবে। এটা তো বাস্তব ঘটনা। জনগণের যেই সংগ্রামী চেতনা তার মধ্যে স্ফুরিত হয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধের যে মূল চেতনা এই বিপ্লবী প্রচেষ্টায় নিহিত ছিলো, এটাকে কর্নেল তাহের বাঁচিয়ে রেখেছেন। এই পথে আগাতে হবে, শিক্ষা নিতে হবে এখান থেকে। বুর্জোয়া শ্রেণির দারস্থ হয়ে, তাদের অনুগ্রহ গ্রহণ করে কর্নেল তাহেরকে স্মরণ করা যাবে না। ফলে সত্যিকার অর্থে কর্নেল তাহেরের বিপ্লবী যে সত্তা, সেটাকে আমরাই ধারণ করি, আমরাই তাঁকে সম্মান করি। কেনো করি? কারণ আমরা বিপ্লব করতে চাই। আমরা পরিষ্কার মনে করি, কর্নেল তাহের নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোনো কাজ করেন নাই। বুর্জোয়া কোনো শক্তির দ্বারস্থ হন নাই। সেই জায়গায় এসে কোথায় ঘাটতি ছিলো? জাসদ রাজনীতির মধ্যে কী ঘাটতি ছিলো? সৈনিক সংস্থার গঠন ও পরিকল্পনার মধ্যে কী ঘাটতি ছিলো? ৭ নভেম্বর জিয়ার উপর নির্ভর করার মধ্যে কী ঘাটতি ছিলো? জিয়াউর রহমানকে শ্রেণি উর্ধ্বে কেন বিবেচনা করা হয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে পরবর্তী পদক্ষেপগুলো সঠিকভাবে নেওয়া কেনো সম্ভব হয়নি, এগুলো তো ইতিহাসের শিক্ষা। কিন্তু কর্নেল তাহের যদি সেইদিন এইভাবে একটা উদ্যোগ না নিতেন, একটা বিপ্লব প্রচেষ্টায় নিজেকে যুক্ত না করতেন, তাহলে আমরা আজকে এই শিক্ষা কোথায় পেতাম? অনেক বড় ক্ষতির মুখে গিয়েও অনেক বড় সম্ভাবনা তিনি উন্মোচন করে দিয়ে গেছেন। আর নিরীহ নির্বিঘ্ন জীবন, ভয়ে পালিয়ে থাকার নোংরা জীবন কোনোদিন কাউকে কোনো স্বপ্ন দেখায়? তারা কোনোদিন কোনো আদর্শকে বুকে ধরতে পারে? ইতিহাস তা বলে না। লড়াইয়ে নামতে হয়। মোকাবিলা করতে হয়। কখনো হারবো, কখনো এগোবো, কখনো পিছাবো। শেষ পর্যন্ত একদিন জয় আসবেই এবং প্রত্যেকবার আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। কিন্তু নত হওয়া যাবে না। শাসক শ্রেণির অনুকম্পায় টিকে থাকার চেষ্টা করা যাবে না। কর্নেল তাহের বলতেন, 'আমাকে ওরা মেরে ফেলতে পারে, কিন্তু আমার স্বপ্নকে মারতে পারে না। এটা জনগণের স্বপ্ন। আজকে আমরা ব্যর্থ হয়ে যেতে পারি। কিন্তু যেই বাংলার জনগণ লড়াই করে দেশ স্বাধীন করেছে, সেই বাংলার জনগণ, তার স্বাধীনতার স্বপ্ন, সংগ্রাম, তার আকাঙ্ক্ষা মরতে দেবে না। যখন রায় হলো, জেলখানার এই ক্ষুদ্র কক্ষে হঠাৎ আওয়াজ উঠলো, তাহের ভাই লাল সালাম। সমস্ত জেলখানা প্রকম্পিত হয়ে উঠলো।

এরপর পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

বিপ্লবের জন্য উৎপাদন পদ্ধতি ও রাষ্ট্র চরিত্র নির্ণয় এবং সঠিক রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণ জরুরি

নবম পৃষ্ঠার পর

রয়েছে বিভিন্ন বস্তু, আর মানুষের রয়েছে শ্রম করার শক্তি। আলাদা আলাদাভাবে এগুলো কিছুই করতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতির বস্তু এবং মানুষের শ্রম শক্তি এই দুটো মিলিত হলে তবেই দ্রব্য সামগ্রী তৈরি হতে পারে। যেমন, কৃষক জমিতে (জমি-প্রাকৃতিক বস্তু) লাঙ্গল, ট্রাক্টর, কোদালের সাহায্যে চাষের শক্তি (মানব শ্রম) দিয়ে ধান, আলু, পটল (দ্রব্য/পণ্য) উৎপাদন করে। অথবা কাঠুরিয়া বনে গিয়ে (বনের গাছ যা প্রাকৃতিক বস্তু) কুঠার-করাত দিয়ে গাছ কেটে, সে গাছ থেকে কাঠ তৈরি করে, সে কাঠ দিয়ে চেয়ার, টেবিল, আলমারি ইত্যাদি আসবাবপত্র তৈরি করে। শ্রমিক তুলা থেকে সুতা, সুতা থেকে কাপড়, কাপড় থেকে জামা-প্যান্ট ইত্যাদি তৈরি করে। এটাই হলো উৎপাদন। প্রথমত, উৎপাদন পদ্ধতি কী? পুঁজিপতি মালিক ও শ্রমিক সম্পর্কিত হয়ে যে উৎপাদন সম্পন্ন হয়, তা হলো পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি। এর আগে, জমিদার বা সামন্ত প্রভু ও ভূমিদাস মিলে যে উৎপাদন সম্পন্ন হতো তা হলো সামন্তীয় উৎপাদন পদ্ধতি ইত্যাদি। আমরা দেখলাম উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক মিলে হয় উৎপাদন পদ্ধতি বা উৎপাদন ব্যবস্থা। তা হলে উৎপাদন শক্তি কী? উৎপাদন শক্তি হলো মানুষ যেখানে শ্রম দিয়ে থাকে সেটা হচ্ছে শ্রমের বস্তু বা ক্ষেত্র। যেমন, কল কারখানা, জমি, খনি এগুলো হচ্ছে শ্রম প্রয়োগের ক্ষেত্র। শ্রমের ক্ষেত্র হাতিয়ার এই দুইয়ে মিলে হয় উৎপাদনের উপায়। এর সাথে মানুষের কায়িক শ্রম এবং মানসিক শ্রম বা উৎপাদন সম্পর্কিত জ্ঞান এই মিলে হয় উৎপাদিকা শক্তি বা উৎপাদনের শক্তি। এখানে শ্রম বলতে বোঝানো হয়েছে শ্রমশক্তি বা প্রয়োগকৃত শ্রম, শ্রমিক উৎপাদনের জন্য যে শ্রম দিয়ে থাকে। শ্রম প্রয়োগের হাতিয়ার হচ্ছে উৎপাদনের হাল হাতিয়ার অর্থাৎ যা দিয়ে উৎপাদন করা হয়। যেমন: তাঁত যন্ত্র, সেলাই মেশিন, ট্রাক্টর, কাস্তে-হাতুড়ি, কম্পিউটার, লাঙল ইত্যাদি। তা হলে দাঁড়ালো শ্রম শক্তি + শ্রম প্রয়োগের ক্ষেত্র + শ্রম প্রয়োগের হাতিয়ার বা শ্রমের উপকরণ + নব নব উদ্ভাবিত প্রযুক্তি এই মিলে হলো উৎপাদিকা শক্তি। উৎপাদন সম্পর্ক কী? মানুষ যেহেতু একা একা উৎপাদন করতে পারে না, তাকে অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা নিতে হয়। উৎপাদন হচ্ছে একটা সামাজিক প্রক্রিয়া, যা সম্পন্ন হয় সম্মিলিত কর্ম প্রয়াসে। যে কোন যুগেই যে কোন উৎপাদন পদ্ধতিতে মানুষ সমবেত হয়ে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। উৎপাদনকে কেন্দ্র করে মানুষের পরস্পরের মধ্যে যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠে তাই উৎপাদন সম্পর্ক। উৎপাদন, বিলিবণ্টন ও ভোগ এগুলো যে কোন সমাজের অর্থনীতির মূল কাজ। ফলে, উৎপাদন পদ্ধতি না বুঝলে সমাজটাকে বুঝতে পারবো না।

এর সাথে সমাজ বিকাশের ইতিহাসটাও আমাদের বোঝা দরকার। সমাজ বিকাশের বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস মার্কস প্রথম আমাদের দেখিয়েছেন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, শ্রেণি সংগ্রাম এবং সমাজ বিকাশের ইতিহাস যা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হিসেবে খ্যাত এগুলোই আমাদের বিশ্লেষণের হাতিয়ার। আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ যেটাকে আদিম সাম্যবাদী সমাজ হিসেবেও অনেকে বলে থাকে, সেখানে উৎপাদন পারস্পরিক শ্রম সহায়তামূলক পদ্ধতি দ্বারা পরিচালিত হত, সেই সমাজ থেকে শুরু করে দাস সমাজ, সামন্ত সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ অর্থাৎ বর্তমানে আমরা যে সমাজে আছি। রাশিয়া, চীন, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া, লাউস, কিউবা, পূর্ব ইউরোপের কিছু দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সামজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা একটা অন্তবর্তীকালীন সমাজব্যবস্থা, এটা কোন স্থায়ী সমাজব্যবস্থা না। পুঁজিবাদী সমাজ থেকে সাম্যবাদী সমাজে যাওয়ার পথে একটা অন্তর্বর্তীকালীন ধাপ।

সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে আদিম সমাজের বৈশিষ্ট্য কী কী এবং কোন সম্পর্কের ভিত্তিতে এখানে উৎপাদন হত, দাস সমাজ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কী কী এবং কোন সম্পর্কের ভিত্তিতে উৎপাদন হতো, সামন্ত ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কী কী এবং কোন সম্পর্কের ভিত্তিতে উৎপাদন হতো, এখন আমরা যে পুঁজিবাদী সমাজে বাস করছি তার বৈশিষ্ট্য কী কী এবং এখানে কোন সম্পর্কের ভিত্তিতে উৎপাদন হচ্ছে এগুলো জানতে পারলে আমরা জানতে পারব যে, কোন সমাজের চরিত্র বৈশিষ্টগুলো কী। কি কি বৈশিষ্ট্য থাকলে সমাজ পুঁজিবাদী হয়। কোন উৎপাদন পদ্ধতির ভিত্তিতে সমাজ পরিচালিত হলে আমরা বলতে পারব যে সমাজে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি চলছে। জাতীয় গণতান্ত্রিক, জনগণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট পার্টি যে বলে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক রূপান্তর সেটাও মূলত, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবেরই একটা রূপ। রাষ্ট্রের চরিত্র ও রাষ্ট্রের উৎপাদন সম্পর্ক আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারলেই শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করতে পারব, বিপ্লবের স্তর সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারব। বিপ্লব করতে হলে শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করা খুব প্রয়োজন। আমরা বলছি রাষ্ট্র যদি পুঁজিবাদী হয় তাহলে বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় আছে এবং তারাই আমাদের প্রধান শত্রু। আমাদের মিত্র হবে সকল সর্বহারা, আধা সর্বহারা, শ্রমিক-কৃষক এর দৃঢ় মৈত্রী এবং পেটিবুর্জোয়া শক্তি হবে আমাদের দোলায়মান মিত্র। আমাদের বিপ্লবের স্তর হবে সমাজতান্ত্রিক। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা এই দেশেও যে গণতান্ত্রিক বিপ্লব হয়েছে তাতে নেতৃত্ব দিয়েছে দেশের বুর্জোয়ারা। তাদের সাথে সর্বহারারাও ছিল। তারাও সামন্তবাদকে উচ্ছেদের লড়াইয়ে থাকে। সর্বহারাদের মিত্র হয়েই বুর্জোয়ারা এখানে সামন্তবাদ উচ্ছেদের লড়াই করে। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব হলে সেই বিপ্লবে উপনিবেশিক শক্তি ও সামন্তবাদী শক্তি উভয়কেই উচ্ছেদ করতে হবে সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যে দলগুলো জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের লাইন নির্ধারণ করেছে তারা বলে আধা পুঁজিবাদ ও আধা সামন্তবাদ, এই বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণি নেতৃত্ব দেবে এবং একটা পর্যায় পর্যন্ত বুর্জোয়ারা মিত্র শক্তি হিসেবে কাজ করবে। চীনেও যেমন আধা সামন্তবাদ-আধা উপনিবেশবাদ উচ্ছেদে সান ইয়াৎ সেনদের সাথে একটা পর্যায় পর্যন্ত চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যৌথ আন্দোলন করেছে। এই রাজনৈতিক লাইনের কারণে আমাদের দেশের বামপন্থি পার্টিগুলো রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় বুর্জোয়াদের সাথে ঐক্য করতে চায়। একেক সময় একেক বুর্জোয়াদের দিকে তাদের ঝোঁক তৈরি হয়। এই প্রবণতা সবসময় শুধু স্বার্থ সুবিধার প্রবণতা না, তাদের রাজনৈতিক লাইন, আর্থ-সামাজিক ব্যাখ্যা, দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্লেষণই তাদের এই প্রবণতার দিকে ঠেলে দেয়।

আজকের এই পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের অবক্ষয়ের যুগে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা জাতীয় মুক্তির যে সংগ্রাম সেই সংগ্রাম বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে হওয়া সম্ভব না, যদি সম্ভবও হয় সেটা আধাখেচরা হবে, পুরোপুরি সম্পন্ন হতে পারে না। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অনেক কাজ অপূরিত থেকে যাবে। যেমন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পরে সংবিধানে আমরা সেক্যুলারিজমের কথা লিখলাম কিন্তু চর্চা কি করতে পারছি? রাষ্ট্রের দিক থেকে সেটা চর্চার কোন বাধ্যবাধকতা আছে? তারমানে এটা হলো যুগের সীমাবদ্ধতা। বুর্জোয়ারা উত্থানের যুগে যে সাম্য-মৈত্রী, ভ্রাতৃত্বের স্লোগান দিয়েছিল, সেই সাম্যের স্লোগান আজ তারা দিতে পারে না, দিলেও কার্যকর করতে পারে না। মৈত্রীর স্লোগানের বাস্তবায়ন তারা করতে পারে না। বুর্জোয়াদের উত্থানের কালে ফরাসি বিপ্লবের সময়ে বুর্জোয়াদের আপেক্ষিক যে প্রগতিশীল চরিত্র ছিল আজকে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের অবক্ষয়ের যুগে তারা প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র ধারণ করেছে। বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়ে তারা যে গণতন্ত্রের কথা, নৈতিকতার কথা বলেছে আজ তারা সেগুলো আর রক্ষা করতে পারছে না। আমাদের দেশেও বুর্জোয়ারা যে অধিকারগুলোর কথা বলেছিল আজ আর সেই অধিকারগুলো তারা দিতে পারছে না বরং অধিকারগুলো খর্ব করে চলছে একের পর এক। শুধু আমাদের দেশেই না আমেরিকা, ইংল্যান্ড যাদেরকে গণতন্ত্রের সুতিকাগার বলা হয় সেখান থেকে শুরু করে সকল দেশেরই, এমনকি পাশের দেশ ভারত যারা সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রের ধারক বলে প্রচার করে। সকল জায়গায় একই অবস্থা। শুধু তাই নয়, নির্বাচনের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে পথ সেই পথও আজ আর রক্ষা করতে পারছে না তারা। অর্থাৎ বুর্জোয়া গণতন্ত্রের যে স্লোগান সেগুলো তারা আর জারি রাখতে পারছে না। তাদের ন্যূনতম মূল্যবোধও তারা টিকিয়ে রাখতে পারছে না।

আমাদের দেশের অনেক বামপন্থি দলের বিপ্লবের স্তর এখনও জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব কিংবা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। কেন? কারণ তারা মনে করে, দেশে এখনও পুরোপুরি না হলেও আধাআধি কিংবা শক্তিশালী অবশেষ নিয়ে সামন্ত ব্যবস্থা বিদ্যমান এবং রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছে সাম্রাজ্যবাদের পুতুল সরকার মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া বা দালাল বুর্জোয়ারা। এদের উচ্ছেদ করে জাতীয় স্বাধীনতা আনতে হবে এবং একটা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তার পর একে টেনে সমাজতন্ত্রে নিয়ে যেতে হবে। আমরা বলেছি, ১৯৭১ সালে বুর্জোয়া শ্রেণির নেতৃত্বে আধাকাচড়া হলেও এখানে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে। কারণ, পুঁজিবাদের প্রগতিশীলতার যুগে বুর্জোয়ারা যে মাত্রায় যতটুকু বিপ্লবী কর্মকাণ্ড করতে পেরেছিল এখন প্রতিক্রিয়াশীলতার যুগে তারা আর সেরকম করতে পারবে না। এরা দিনে দিনে আরও প্রতিক্রিয়াশীল হবে। আজকে তারা বুর্জোয়া অর্থব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠানিক আয়োজন, সংস্কৃতির বিকাশকে আধুনিক জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে না। কেউ কেউ শ্রেণি চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, আওয়ামী লীগ হচ্ছে মুৎসুদ্দি বা সাম্রাজ্যবাদের দালাল বুর্জোয়া এবং এরা সাম্রাজ্যবাদের হাতের পুতুল। আবার কমিউনিস্টদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন এদের মধ্যে একটা অংশ প্রগতিশীল এবং আরেকটা অংশ হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল। স্বাধীনতার পরে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের প্রগতিশীল অংশ রাষ্ট্র ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে ছিল তাই সে সময় প্রগতিশীল বুর্জোয়াদের সাথে মিলে অসম্পূর্ণ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পূর্ণতায় নিয়ে সমাজতন্ত্রে যাওয়া যাবে। অর্থাৎ প্রগতিশীল বুর্জোয়ার সাথে থেকে পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে ক্ষমতায় অংশ নিয়ে বুর্জোয়া বিপ্লবের করণীয় কাজগুলো সম্পন্ন করার প্রক্রিয়ায় সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাওয়া যাবে। প্রগতিশীল উপাদান কী? সেটা হচ্ছে শিল্পকারখানা জাতীয়করণ করা, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সহনীয় পর্যায়ে কিছু অবস্থান নেয়া, সমাজতন্ত্রের কথা বলা ইত্যাদি। সে তত্ত্বের ভিত্তিতে বুর্জোয়া একনায়কতান্ত্রিক বাকশালেও তারা যোগ দিয়েছিল। এখন অবশ্য সেটা যে ভুল পদক্ষেপ ছিল তা তারা স্বীকার করছেন। তবে আমরা যেভাবে বিচার বিশ্লেষণ করি তাদের জায়গা ঠিক সেরকম নয়। পিকিংপন্থি নামে যারা চিহ্নিত ছিলেন তাদের ব্যাখ্যা হচ্ছে আওয়ামী লীগ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের দালাল, মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া মানে সাম্রাজ্যবাদের কমিশন এজেন্ট। এরা স্বাধীন বুর্জোয়া নয়, এরা সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষা করার বিনিময়ে সুবিধা ভোগ করে কমিশন ভোগ করে। যারা নিজের দেশে স্বাধীনভাবে বুর্জোয়াদের স্বার্থে কাজ করে তারা হচ্ছে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধি। স্বাধীনতার পর থেকে যারা শাসন ক্ষমতায় এসেছে বা আছে তারা কেউ জাতীয় বুর্জোয়া নয়। এরা সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এরা সাম্রাজ্যবাদের তল্পিবাহক দেশীয় দালাল বুর্জোয়াদের স্বার্থের পক্ষে কাজ করে। আমরা বলেছি স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগের অনেক সীমাবদ্ধতা থাকলেও এরা জাতীয় বুর্জোয়া। এদের গঠনকালীন বক্তব্য, ধারাবাহিক আন্দোলনের কর্মসূচি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সব কিছু মিলে এরা বুর্জোয়া শ্রেণির পক্ষে ও স্বার্থে প্রধানত রাজনীতি করে। তারা পুঁজিবাদের বিকাশের জন্য তাদের কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ, রাষ্ট্রকে সেভাবে পরিচালিত করে। কথা হলো বুর্জোয়াশ্রেণিকে যে কোণ থেকেই দেখি না কেন, এদের সাথে যোগসাজস করে শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থ রক্ষা হবে না, সমাজতন্ত্রের পক্ষে অগ্রসর হওয়ার প্রশ্নই আসে না। বুর্জোয়া বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজও সমাপ্ত করা যাবে না। এ যদি হয় উপলব্ধি তা হলে বিপ্লবের স্তর নিয়ে বিভ্রান্তিতে না ভুগে, বিপ্লবের লক্ষ্যে সংগ্রাম অগ্রসর করতে করতেই বিভ্রান্তি কাটবে। কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের কাছে রণনীতি এবং রণকৌশলের ধারণা বলতে কী বোঝায়? নভেম্বর বিপ্লবের ইতিহাস থেকে এখনো দেশে দেশে কমিউনিস্টরা সেই পাঠ গ্রহণ করছে। রণনীতি একটা দীর্ঘকালীন সময়ের বিষয়, যা কেবলমাত্র অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটলেই পরিবর্তিত হয়। অন্যদিকে একটি নির্দিষ্ট যুগে বা কালপর্বে রণনীতি বাস্তবায়নে আন্দোলনের জোয়ার এবং ভাটার সাপেক্ষে নির্ধারিত হয় রণকৌশল। অর্থাৎ যুদ্ধের নীতি ও যুদ্ধ পরিচালনা কৌশলই হলো রণনীতি-রণকৌশল। এ বিষয়ে কমরেড স্তালিন বলেছেন, যেহেতু এই সমস্ত উপাদানগুলি এক বাক থেকে অন্য বাকের মাঝে পড়ে যায় ও সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিবর্তিত হয়. সে কারণে সমগ্র যুদ্ধকে পরিব্যপ্ত না করে যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এমন একটি নির্দিষ্ট লড়াই সাপেক্ষে সে বিশেষ পর্বে রণকৌশল অসংখ্যবার পরিবর্তিত হয় বা হতে পারে।

আজকের বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা কর্পোরেট পর্যায়ে চলে গিয়েছে। এখন কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশ বুঝতে হলে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির সাথে এর পার্থক্যটা বোঝা দরকার। লেনিন তার একাধিক রচনায় এবিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেলন, 'ব্যক্তি মালিকানা এবং উদ্বৃত্ত শোষণ এই দুই ব্যাপারে সামন্ততন্ত্র এবং পুঁজিবাদের সাদৃশ্য থাকলেও জমির মালিকানার চরিত্র, উৎপাদনের উদ্দেশ্য, উৎপাদন সম্পর্ক এবং উৎপাদিকা শক্তির অবস্থা এই চারটি বিষয়ে দুই ব্যবস্থায় মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।

এই বুর্জোয়া ব্যবস্থায় শিল্পের বিকাশ আমাদের দেশে যটটুকু হওয়ার কথা ছিল সেটা তারা করতে পারে না তাদের সেই প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকার কারণেই। উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করবে হয় দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার নয়তো দেশের বাইরের বাজারে। কিন্তু এদের দেশের অভ্যন্তরেও বাজার নাই দেশের বাইরেও নাই। দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার বৃদ্ধির জন্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। সেটা করার জন্য যে ন্যূনতম মজুরি দরকার সেটা দিচ্ছে না। তাহলে শিল্পের বিকাশ ঘটবে কীভাবে? তাই যে মাত্রায় বিকাশ হওয়ার কথা ছিল সেই মাত্রায় হয় নাই, একটা স্তর পর্যন্ত হয়েছে। সেটা আমাদের বাজেটের আকার, জিডিপির আকার দেখলে বোঝা যায়। স্বাধীনতার পরে যেমন ছিল তার চেয়ে কয়েকগুণ বড় হয়েছে এখন। অর্থাৎ আমাদের অর্থনীতির ভিত্তি অনেক শক্তিশালী হয়েছে। একটা পর্যায় পর্যন্ত এটা হয়েছে, কিন্তু বেশিদূর যাবে না। স্থবিরতায় সে পড়বেই। কারণ মানুষের কেনার ক্ষমতা না বাড়লে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার ক্রমাগত সংকুচিত হবে। এর কারণে বাইরের বাজারও সংকুচিত হবে। দুইটা বাজারই যদি সংকুচিত হয় তাহলে শিল্পের বিকাশ ঘটবে না, কলকারখানা স্থাপন হবে না। তারপরও আমাদের দেশের পুঁজি বাজার অনেক বেশি সম্প্রসারিত

এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

কর্নেল তাহের : সমাজ বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর এক লড়াকু জীবন

দশম পৃষ্ঠার পর

জেলখানার উঁচু দেওয়াল এই ধ্বনিকে কি আটকে রাখতে পারবে? এর প্রতিধ্বনি কী পৌঁছাবে না আমার দেশের শোষিত মানুষের মনের মনি কোঠায়? শাসক- শোষক শ্রেণি সৃষ্ট শত বিভ্রান্তি বিপত্তি কি দেশের মানুষকে এই ঘটনা বিস্মৃত করতে পেরেছে? বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কর্নেল তাহেরের ঐ ধ্বনি সারাদেশের গ্রাম-গঞ্জের ঘরে ঘরে নিয়ে যাবে। আমাদের দেশের একজন গুণিজন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক আহমেদ ছফা একটা লেখা লিখেছিলেন। সেখানে তিনি বলেছেন, তাহের যে সমাজ প্রতিষ্ঠার ডাক দিয়েছিলেন, সেই আহ্বানের শ্যামের বাঁশী এই দেশের শোষিত বঞ্চিত মানুষের মন মগজে ঢেউ তুলবেই। তারা সংগঠিত হবেই। তারা জয়লাভ করবেই। যাদের অনিবার্য বিজয়ের ভরসা করে তাহের হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করতে পেরেছিলেন, তাদের সংগ্রামের জেদ এবং আকাঙ্ক্ষার আগুন আমরা যদি ধারণ করতে পারি, তাহলে খুবই ভালো কথা। যদি না পারি, তাহলে কালের ধুলোকাদায় আমাদের গড়াগড়ি খেতে হবে। কারণ ইতিহাস এবং সময়কে ফাঁকি দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের কারো নাই। তাহের যে কাজের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন, সেই কারণ জয়যুক্ত হলেই তাঁর প্রকৃত মূল্যায়ন হতে পারে। ইতিহাস আমাদের পরিত্যাগ করবে কর্নেল তাহেরের স্বপ্নটা পরিত্যাগ করা হলে। আমরা পরিত্যাগ করি নাই, আমরা বিপ্লবের কথা বলি। রাজনৈতিক অঙ্গনে বামপন্থি বিপ্লবী রাজনীতির কথা বলি। ভুল-বিচ্যুতি থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে চলি।

যৌথতার শক্তিই বুর্জোয়া আক্রমণকে পরাস্ত করার সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে পারে

কর্নেল তাহেরের বিপ্লবী চরিত্রের আরেকটি দিক। রায় হওয়ার পর কারারক্ষীরা টানাটানি করছে সবাইকে নিয়ে যাবে, কর্নেল তাহেরকে নিয়ে যাবে কনডেম সেলে আর সবাইকে সাধারণ সেলে। মামলাটা ছিলো স্টেট ভার্সেস মেজর জলিলের নামে। ফাঁসি হলো কর্নেল তাহেরের। কারণ তারা জানতো এখানে মূল শক্তি তাহের, তাকেই শেষ করা দরকার। শেষ করলেই তারা নিরাপদ বোধ করবেন। যুদ্ধে পা হারিয়েও বীরোত্তম কর্নেল তাহেরের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষ অবদান খুঁজে পাওয়া গেল না।

উনি বলছেন, সবাই আমার কাছে কয়েকটি কথা শুনতে চাইলো। প্রত্যেকের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা হয়েছিল। মেজর জলিল, আ স ম আব্দুর রব থেকে শুরু করে অনেকেই ছিলেন। তো এর মধ্যে জেল কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলো। আমি বললাম, আমি যখন একা থাকি, তখন ভয়, লোভ-লালসা আমাকে চারিদিক থেকে আক্রমণ করে। আমি যখন আপনাদের মাঝে থাকি, আমার সমস্ত ভয়, লোভ-লালসা দূরে চলে যায়। আমি সাহসী হই, বিপ্লবের হাতছানি পাই। সমস্ত বাধা বিপত্তি দূর করার একটা অপরিমেয় শক্তি আমার মধ্যে কাজ করে। তাই আমাদের একাকীত্বকে বিসর্জন দিয়ে আমরা সবার মধ্যে প্রকাশিত হতে চাই, সেজন্য আমাদের সংগ্রাম। যেটাকে আমরা বলছি যৌথ তার সংগ্রাম। বুর্জোয়া আক্রমণ একাকী মানুষকে বিধ্বস্ত করে দেয়। আর মানুষ যখন যৌথভাবে এর মোকাবিলা করে, তখন বুর্জোয়া আক্রমণ শক্তিহীন হয়ে পড়ে। এই কথাটাই আমরা বলি। একা আপনি ভাববেন, একা বাঁচতে চাইবেন, একা কিছু লোভ-লালসা, স্বার্থ সুবিধা চাইবেন, আপনি আদর্শিক নৈতিক লড়াইয়ে পরাস্ত হয়ে যাবেন। আর নৈতিক, যৌক্তিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে যখন যৌথভাবে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন, তখন প্রতিক্রিয়ার সকল শক্তি পরাস্ত হবে। এই কথাটাই আমরা ধারণ করি।

বিপ্লব, বিপ্লবী সংগ্রাম আর জনগণের মধ্যেই খুঁজেছেন নিজেকে, ব্যক্তিস্বার্থকে বিলীন করেছিলেন সমষ্টির স্বার্থে

কর্নেল তাহের তার নিজের কোনো সম্পদ রেখে যান নাই। দেখেন, মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডার ছিলেন, পুরো পরিবার নিয়ে যুদ্ধ করলেন, খেতাব পেলেন, তারপরও কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে সহায় সম্পত্তি তিনি করেন নাই। তার সন্তানদের কথা তিনি বলেছেন, 'নিতু, যিশু এবং মিশুর কথা মনে পড়ে। কিন্তু আমার গোটা জাতি রয়েছে তাদের জন্য। আমরা দেখছি শত সহস্র মায়া মমতা ভালোবাসা বঞ্চিত উলঙ্গ শিশু। তাদের জন্য একটা নিরাপদ আশ্রয় করতে চেয়েছি।' দেখেন, কী ধরণের একটা মনুষ্যত্ব বোধের কত উন্নত জাগ্রত রূপ হলে এমনটা বলা যায়। হাজার হাজার মায়া মমতা বঞ্চিত উলঙ্গ শিশু এবং এরা নানা বঞ্চনার শিকার। এদের কথা না ভেবে কেবল আমার সন্তানের কথা ভাববো? কর্নেল তাহের তা ভাবেননি। বলেছেন, গোটা দেশ তো রয়েছে। দেশের মানুষ দেশকে রক্ষা করবে, নিজেরা বাঁচার রাস্তা করবে, সেই সাধারণের মাঝে আমার সন্তানও থাকবে। আলাদা ভাবে নয়। সমস্ত মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা ভুলে গিয়ে নিজে সুখে শান্তিতে থাকবো, সম্পত্তি গড়বো, সন্তানদের নিয়ে নিরাপদে থাকবো— কর্নেল তাহের তা করেননি। ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে তিনি মেজর জিয়াউদ্দিনের লেখা কবিতা পড়লেন—

'জন্মেছি সারা দেশটাকে কাঁপিয়ে তুলতে, কাঁপিয়ে দিলাম...
জন্ম আর মৃত্যুর দুটি বিশাল পাথর রেখে গেলাম
পাথরের নিচে, শোষক আর শাসকের কবর দিলাম
পৃথিবী, অবশেষে এবারের মতো বিদায় নিলাম।'

পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সংগ্রামে এক অনন্য সাহসি বীর কর্নেল তাহের

কর্নেল তাহেরের এই যে বিপ্লব প্রচেষ্টা, এর ঘাটতিগুলো কী, দুর্বলতা কী, ব্যর্থতার কারণ কী সেগুলো জানার চেষ্টা করি আর সবচেয়ে বড় কথা এই বিপ্লব প্রচেষ্টায় তাঁর যে সাধনা, যে সংগ্রাম আর মোকাবিলা করার যে সাহস, সেগুলো আমরা ধারণ করি। ফলে যদি আমরা সেই শিক্ষা নেই আর কর্নেল তাহেরের যে বীরত্বপূর্ণ শৌর্য গাঁথা এবং নিজেকে আদর্শের জন্য উৎসর্গ করা- সেগুলো সঞ্চারিত করতে পারি আর ঐ শিক্ষাটা যদি দেশবাসীর কাছে সঠিকভাবে নিয়ে যেতে পারি, তাহলে বাংলাদেশে বিপ্লবের শিখা আবার জ্বলবে। একশ বছর, দুইশ বছরেও এই শিখা নির্বাপিত হবে না। ইতিহাসের অনেক ঘটনায় অনেক সময় লেগে যায়। ইংরেজরা দুইশ বছর রাজত্ব করে নাই এই দেশে? তাদের তাড়াতে অনেক সংগ্রাম অনেক ব্যর্থতার পর সফলতা এসেছে। এর মধ্যে অনেক দেশে বিপ্লব হয়েছে অসংখ্য বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু শেষ কথা কী? সমাজ বিকাশের নিয়মে সমাজ এগিয়ে যাবে। সময়ের দূরত্ব দিয়ে যতিচিহ্ন টানা যাবে না। প্যারি কমিউনের ব্যর্থতার শিক্ষা নিয়ে ৪০-৪২ বছর পর রাশিয়ায় বিপ্লব করেন লেনিন। আবার ষাটের দশকের যে বিচ্যুতি, নব্বইয়ের সমাজতন্ত্রের পথ থেকে পুঁজিবাদে প্রত্যাবর্তন ইতিহাসের শেষ কথা না। এই শিক্ষা নিয়ে আবার রাশিয়ায় হোক বা সারা দুনিয়ায় আগুন জ্বলা শুরু হবে এবং সেই আগুন জ্বলছে। যখন রাশিয়া সমাজতন্ত্রে ছিলো, তখন পূর্ব ইউরোপের সমস্ত দেশ স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছিলো। তারপরও সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সরকার বলেছিলো, যার যখন ইচ্ছা সে তখন চলে যেতে পারে, বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার দিয়েছিলো। আর আজকের পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া কী করছে? ওই দেশগুলোকে আবার দখল করার চেষ্টা করছে। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ, ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্যবাদ মিলে এই সমস্ত এলাকা লুটপাট করে খাওয়ার ধান্ধা করছে। সাম্রাজ্যবাদ বনাম সাম্রাজ্যবাদ দ্বন্দ্বে, তাদের যুদ্ধ উন্মাদনায় সারা পৃথিবী অস্থির। ঘটছে সামরিক অভ্যুত্থান, সামরিক অভ্যুত্থান বিরোধী গণবিক্ষোভ, তার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক আওয়াজে মুখরিত রাজপথ, বহু অঞ্চল-দেশ, ল্যাটিন আমেরিকা জুড়ে কোন কোন দেশে সমাজতন্ত্রীদের উত্থান এবং বহু দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবও হয়ে যেতে পারে। এর মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্থানের সম্ভাবনা যেমন আছে, তেমনি ব্যাপক গণজাগরণ এবং তার মাধ্যমে শোষিত মানুষের ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনাও তৈরি হচ্ছে। আমেরিকার মতো দেশেও নিরানব্বই ভাগ বনাম এক ভাগের এই আন্দোলন একসময় মার খেয়ে গেছে। কিন্তু ঐটা তুষের আগুনের মতো জ্বলছে। ইংল্যান্ডে এখন অস্থির শাসনব্যবস্থায় সমাজতন্ত্রের কথা উঠছে। ফ্রান্সে আওয়াজ উঠছে। স্পেনে আওয়াজ উঠছে। কালকেই সেখানে সমাজতন্ত্র হবে তা না। কিন্তু মানবজাতি বুঝতে শুরু করেছে যে পুঁজিবাদ যতদিন টিকে থাকবে, সাম্রাজ্যবাদ যতদিন টিকে থাকবে, আমরা ঘুরে ঘুরে এক বিপদ থেকে আরেক মহাবিপদে, এক সংকট থেকে আরেক মহাসংকটের দিকে ধাবিত হবো। আর প্রত্যেকটা সংকটে বুর্জোয়ারা জনগণকে তার মধ্যে ফেলে তাদের উপর অধিক মাত্রায় শোষণ চাপিয়ে সেখান থেকে মুনাফা করবে। তাহলে এ থেকে পরিত্রাণ কী? হয় সংকটকালে বুর্জোয়াদের উৎখাত করে দাও, শ্রমিক শ্রেণির রাজত্ব কায়েম করো, নাহলে তাদের শোষণ নিপীড়নে নির্যাতিত হয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাও। সভ্যতাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দাও। রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে জার সরকারকে উৎখাত করে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মাধ্যমে বুর্জোয়া শ্রেণি ক্ষমতা দখল করলো, আর নতুনভাবে যখন সংকট তৈরি হলো, রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণি তখন এই বুর্জোয়াদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে মানব মুক্তির রাস্তা তৈরি করলো। তাহলে দুনিয়ার দেশে দেশে ইতিহাসের এই শিক্ষা নিতে হবে যে পুঁজিবাদ সৃষ্ট সংকট মানেই হলো জনগণের উপর তার বোঝা বহু গুণ বৃদ্ধি পাওয়া। বেকারত্ব বাড়বে, কর্মহীনতা তৈরি হবে, আয় কমে যাবে এবং সমাজে অস্থিরতা দেখা দেবে। খেয়াল রাখবেন, শোষণ যত বাড়বে, সামাজিক বৈষম্য বাড়বে আর ভারসাম্য নষ্ট হবে। আপনি লঞ্চে কিংবা নৌকায় করে নদীতে যাওয়ার সময় যদি একপাশ বেশি কাত হয়ে যায়, তাহলে তো ডুবে যাবে। সমাজে বৈষম্য যখন বাড়ে, তখন সামাজিক অপরাধ বহুমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে সমস্ত জায়গায়। আজকে দেখেন, ঘরে ঘরে অশান্তি, হানাহানি, সংঘাত চলছে। এগুলো কিন্তু ঐ শোষণের ফলাফল। স্বামী স্ত্রীকে মেরে ফেলে, চোখ তুলে ফেলে, ভাই বোনকে হত্যা করে, নারীকে গণধর্ষণ করে তার জীবনের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে ফেলে। বাপ ছেলেকে মেরে ফেলে, ছেলে বাপকে। আত্মহত্যায় বহু সম্ভাবনাময় জীবন অকালেই ঝরে যাচ্ছে। এসব আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি। এগুলো কী? চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই—মানুষে মানুষে সংঘাত, সংঘর্ষ, খুনখারাপি—এইসব জিনিস হচ্ছে শোষণমূলক ব্যবস্থায় বৈষম্যের কারণে সৃষ্ট সামঞ্জস্যহীনতার ফলাফলে সৃষ্টি হওয়া অপরাধ। সামাজিক বৈষম্য থেকে অপরাধ জন্মলাভ করে। মানুষের ঘরে খাবার থাকবে না, পুলিশ দিয়ে কি আপনি চোর ঠেকাতে পারবেন? পারবেন না। তাই চোরকে বলেন চুরি করতে, গৃহস্থকে বলেন সজাগ থাকতে। যদি একটা মানুষের মানবিক জীবনযাপন করার সুযোগ থাকে, সে কিন্তু চুরি করতে যাবে না। ঢাকার শহরে দশ বারো লাখ লোকের কোনো নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা নাই। এরমধ্যে পাঁচ ছয় লাখ মানুষকে অনিয়ম অবৈধ পথের খোঁজ করে বাঁচতে হচ্ছে। এখন এই যে বিষয়গুলো, ঘরে ঘরে অশান্তি ঢুকে যাচ্ছে। আপনি পরিবারে সুস্থ থাকতে পারবেন না, সমাজে সুস্থ থাকতে পারবেন না। মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব সামাজিক দূরত্ব বাড়তে থাকবে। আমেরিকার অবস্থা কী খেয়াল করেন। আমেরিকায় গত পাঁচ ছয় মাসে শিশুসহ তিনশ'র মতো মানুষকে অনির্দিষ্ট অকারণে গুলি করে মারা হয়েছে। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মেরে ফেলছে, হাসপাতালে ঢুকে মানুষকে গুলি করে। কাকে মারে কেন মারে তার উদ্দেশ্য পরিষ্কার থাকে না। কী ভয়ানক অবস্থা। যারা মারছে তারা মানসিক ভারসাম্যহীন। বলছে, তারা সাইকোপ্যাথ, সিজোফ্রেনিক। অর্থাৎ, পারিবারিক সামাজিক বন্ধন নাই, মানবতা বর্জিত পুঁজিবাদী দৌড়ে হারজিতের মরণ খেলা—এক ধরণের একটা অসুস্থ পরিবেশ। মানুষকে ডলার সম্পর্কে বাঁধা হয়েছে। আমেরিকায় প্রতিটি নাগরিকের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া হয়েছে। এটা নাকি তাদের নিরাপত্তার জন্য। নিরাপত্তা কি অস্ত্র থেকে আসে? নিরাপত্তা আসে মানুষের সাথে মানুষের মানবিক সামাজিক বন্ধনে। ১৯৭১ সালে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। তাদের কাছে অস্ত্র ছিলো শত্রু নিধনের জন্য কিন্তু নিজেদের নিরাপত্তার জন্য ছিল স্বাধীনতার মুক্তি চেতনায় গড়ে ওঠা সামাজিক বন্ধন। কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে বৌদ্ধ, কে খ্রিষ্টান এগুলোর কোনো হিসাব ছিলো না। মানুষ এক পরিবারের সদস্যদের মতো মিলিত হয়ে গিয়েছিল। তাহলে মানবিকতা, মনুষ্যত্ববোধ, সামাজিক চেতনা ও সমসত্ব বোধ যতো জাগ্রত হবে, মানুষ মানুষের কাছে আসবে, মানুষের মাঝে মিলন সম্পর্ক তৈরি হবে, উন্নত মানবিক সম্পর্কের বন্ধন তৈরি হবে। আর মানুষের উপর শোষণ যত বাড়তে থাকবে, মানুষ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, স্বার্থপরতা তৈরি হবে। মানুষ মানুষকে শত্রু ভাববে। পুঁজিবাদী ভোগবাদ সৃষ্ট লোভ লালসা উন্নত জীবন লাভের সংস্কৃতিতে বিভোর করে না, কৃত্রিম উত্তেজনা, হতাশা, নেশাগ্রস্ততায় ডুবিয়ে দেয়। দেশে আশি লাখ কিশোর তরুণ মাদকাসক্ত। পর্নগ্রাফি বাড়ছে। চিন্তা করেন, আমাদের একটা শিশু ছোটবেলা থেকে মা-চাচি, জেঠি-খালা, ফুফু দাদী এই সমস্ত নারীদের পরিচর্যায়, তাদের স্নেহ-মমতায় বেড়ে উঠে। ফলে এই নারীদের যে মূর্তি তাদের ভাবমানসে অঙ্কিত হয়, যে সম্মান এবং তাদের স্নেহ-মমতার ভেতর দিয়ে যে মূল্যবোধ তৈরি হচ্ছে, আপনি পর্নগ্রাফির ভেতর দিয়ে সেই নারীকে উলঙ্গ করে হাজির করে দিলেন। তাহলে যে কিশোরটি বেড়ে উঠছে অসংখ্য নারীর স্নেহ-মমতা পেয়ে এবং তাদের প্রতি সম্মানবোধ নিয়ে, সে এখন নারীকে একটা ভোগ্যপণ্য হিসেবে দেখতে শিখছে। তাহলে এই ছেলের ভবিষ্যৎ কী আর গোটা সমাজব্যবস্থার ভবিষ্যৎ কী? নারীর অধিকার বঞ্চনা, নারীনির্যাতন ইত্যাদি ভয়ানকভাবে বাড়ছে তার চেয়ে বড় কথা পুরুষদের মানসিক সাংস্কৃতিক উন্নতির পথ কীভাবে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে তা ভাবার কি দরকার নাই? শুধু মোবাইল ফোন আধুনিক মেশিন ব্যবহার করে এরা কী শিখবে? পুঁজিবাদ মজুরি দাসত্বের সীমানায় আটকে রাখতে ও তাদের মুনাফার মানবযন্ত্র হিসাবে কাজে লাগার যে শিক্ষা তার বাইরে যেতে চাইবে না। তাই জ্ঞান মানে পুঁজিবাদ টিকিয়ে রাখার জ্ঞান, দক্ষতা মানে কর্পোরেট হাউজের কর্মপরিচালনার দক্ষতা, সাফল্য মানে লোক ঠকিয়ে বা চাতুর্যে ব্যক্তির আরাম-আয়েস, অর্থ বিত্ত লাভের সাফল্য। সমাজের উন্নতির সাথে নিজের উন্নতি, সামাজিক সুস্থতার সাথে নিজের সুস্থতা যুক্ত না করে পূর্ণ মানুষ হওয়া যায় না। কর্নেল তাহের সে সময় নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে যে লড়াইটা করে গেছেন। সেখান থেকে লক্ষ কোটি তরুণদের আজকে উৎসাহিত হওয়ার কথা ছিলো, প্রাণশক্তি ফিরে পাওয়ার কথা ছিলো। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের একটা লড়াকু মনোভাব সৃষ্টি হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু বুর্জোয়ারা সেই সম্ভাবনা ধ্বংস করছে। তারা সামরিক বাহিনীকে গণবিচ্ছিন্ন করে ব্যবসায় নামিয়ে দিয়েছে, পুলিশকে—যেই পুলিশ রাজারবাগে হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রথম লড়াই করলো এবং জীবন দিলো, তাদের জনগণের বিরুদ্ধে নামিয়ে দেয়া হল। যে বিডিআর যুদ্ধের প্রথম প্রহরে জানবাজি লড়াই লড়লো, তারা কেন

এরপর পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৩

শোষণ ও দুঃশাসন হটাতে চাই-পুঁজিবাদের অবসান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আয়ের ২ লাখের বেশি মানুষের বাস। এখানে ২ জন কাউন্সিলর কর্তৃত্ব করে যা মাঝে মাঝেই সংঘাতে রূপ নেয়। এই বস্তি থেকে মাসে ভাড়া উঠে ২৫ কোটি টাকা। এখানে অবৈধ গ্যাস-বিদ্যুৎ, পানি সংযোগের জন্য নেয়া টাকার হিসাব নাই; কিন্তু এই টাকা রাষ্ট্র পায় না। এই বিপুল পরিমাণ টাকা দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতির ছাত্রছায়ায় নানা মহলে বিলি বণ্টন হয়। শুধু কড়াইল নয়, সব বস্তির একই হাল।

পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন মালিকানাধীন গুলশান উত্তর কাঁচাবাজার দোতলাকে অবৈধ তিন তলা বানিয়ে ১৪১ দোকান বসিয়েছে ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীরা। এই মার্কেট থেকে বছরে ভাড়া উঠে ১ কোটি ১৮ লাখ টাকা। (প্রথম আলো ১৯ অক্টোবর '২২) সিটি কর্পোরেশনের কাজগুলো বণ্টিত হয় ক্ষমতাসীনদের মধ্যে। ফলে না থাকে মান আর না থাকে জবাবদিহিতা। ছোট একটা উদাহরণ দেয়া যায়, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন তিন দফায় ৭৪ লক্ষ টাকার মশার ওষুধ কিনেছে নগর ছাত্র লীগ নেতার প্রতিষ্ঠান থেকে। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা বর্ণনা করা যাবে। এগুলি তো ছোট খাট ঘটনা। আর নদী দখল-জমি দখল, ব্যাংক-শেয়ার বাজার লুট, বিদেশে টাকা পাচার, ভুয়া কোম্পানি খুলে শত শত মানুষকে নিঃস্ব করা, বিদ্যুৎ উৎপাদন না করেও ক্যাপাসিটি চার্জের নামে ৯০ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়া, ১০০ টাকার কাজ বাগিয়ে নিয়ে ১০ টাকায় কাজ কোনভাবে করে বা না করে ৯০ টাকা আত্মসাৎ করা ইত্যাদি তো আছেই। এভাবেই বুর্জোয়া শ্রেণিভুক্ত দলসমূহ পুঁজিবাদী শোষণে লুটেরাগোষ্ঠী তৈরি করতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে অসহায় করে রেখেছে। অসহায় মানুষ শিক্ষার অভাবে বুঝতে পারে না কার্যকারণ বা বুঝতে পারলেও জিম্মি হয়ে থাকে বা জিম্মি হতে বাধ্য হয়। অক্ষম জনতা হয় উপরে হাত তুলে চোখের জল ঝরায় না হয় জমিনে শোষকদের ইচ্ছার কাছে লুটিয়ে পড়ে বা করুণা প্রার্থী হতে বাধ্য হয়। মাঝখানে থাকা উচ্ছিষ্ট সুবিধাভোগীগোষ্ঠী এ কাজে লাঠিয়াল বা সহায়কের ভূমিকা পালন করে। এরা নীতি আদর্শকে উপহাসের বস্তুতে পরিণত করে। টাকার শক্তিতে শক্তিমানরা মানবতাবোধকে পিষে মারে।

গণতন্ত্রের মহিমা কীর্তন করতে করতে ভোটকে কেনাবেচার পণ্যে পরিণত করে। সারা পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ায় ভোটের হাট বসে নির্দিষ্ট সময় অন্তর। বাংলাদেশের কারবারি শাসক দল সব ভোট-পণ্য গুদামজাত করে নিয়েছে। এখন দেশি বিদেশি বণিকগোষ্ঠী গুদাম খুলে খোলা হাট বসাবার কসরৎ করে চলেছে। জনগণের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারগুলোকে যে হাওয়ায় মিলিয়ে দেয়া হয়েছিল স্বাধীনতার পর থেকে ধাপে ধাপে, তা প্রকৃত মালিক জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার আলোচনা বা পন্থা নিয়ে কোন কথা নেই। রাজনীতি থেকে নীতি বিসর্জন দিয়ে বুর্জোয়ারা রাজনীতিকে খেলা বানিয়েছে। খেলা হবে এই ঘোষণা দিয়ে তারা গদি রক্ষা আর গদি দখলের খেলা দেখাচ্ছে। ক্ষমতার মালিক জনগণ ক্ষমতাহীন হয়ে তামাশার পর তামাশা দেখছে দিনের পর দিন। একটু সুদিনের আশায় বারবার এদের কাছে গিয়ে আরও বেশি দুর্দিনের কবলে পতিত হচ্ছে। কারণ জনগণের প্রকৃত রাজনৈতিক শক্তি বামপন্থিরা এখনও দৃশ্যমান নয়। কিংবা যারা আছে তাঁরা পরিস্থিতি মোকাবিলায় নিজেদেরকে সমর্থবান করে তুলতে পারছে না, যেমন ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধকালেও পারেনি। তবে এটাই শেষ কথা নয় কিংবা এটাই শেষ পরিণতি নয়।

সমাজের বিকাশ এবং তার অংশ হিসাবে রাজনৈতিক সংগ্রামের বিকাশের প্রয়োজনেই তা সামনে আসতে বাধ্য। এই কাজে করণীয় হলো, হতাশা-প্রলোভন, পুঁজিবাদের ছায়ায় আত্মরক্ষার তাগিদে বুর্জোয়া লেজুড়বৃত্তি, কিছু না করে কোন ঝুঁকি না নিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভে টিকে থাকার মনোবৃত্তি, নাম ভাসিয়ে রাখতে আদর্শের ঝান্ডা ফেলে ভোটের জোটে ঢোকা, পেটি বুর্জোয়া অস্থিরতায় পড়ে বিকল্প রাজনীতি এবং সংস্কৃতি গড়ার সর্বোচ্চ সাধ্যের শেষ চেষ্টা না করে বিভক্তি বিভ্রান্তির স্বস্তিতে থাকা, চিলে কান নিয়েছে প্রচারে দৌঁড়ে বেড়ানো, এসব অসুখ সারাতে হবে। এর জন্য দরকার শুধু মার্কসবাদের বুলি আওড়ানো নয়, মার্কসবাদী মূল দৃষ্টিভঙ্গি, বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ পদ্ধতিকে সঠিকভাবে রপ্ত করা এবং আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসের সঠিক পর্যালোচনার মাধ্যমে অতীত ভ্রান্তি-বিচ্যুতি চিহ্নিত করা। যাতে আমরা শ্রমিক কৃষক-মেহনতি মানুষের অসংগঠিত ক্ষমতাকে সংগঠিত শক্তিতে রূপান্তর করতে পারি। দুনিয়ার মজদুর এক হও শ্লোগানকে কার্যকর করতে বাংলাদেশের মজদুরকে এক হওয়ার জায়গায় আনতে পারি। উদারপন্থিদের দাসত্বের বদলে সর্বহারা শ্রেণির মিত্র হিসাবে জড়ো করতে পারি।

এখন দুই বড় বুর্জোয়া দলের মহড়ায় মানুষ সামনে বিপদের প্রমাদ গুনছে। কিন্তু যে কথাটা বুঝতে পারছে না যে এর ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং বুর্জোয়া শ্রেণির শাসন থাকলে সংকট চলমান থাকবে আর মহাসংকট বারে বারে ঘুরে ফিরে আসবে। যেমন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত ৩টি মহাসংকট পার হয়ে এখন চতুর্থ মহাসংকটে পড়েছে। প্রথমটি ছিল ১৯৭৫ সালে, দ্বিতীয়টি ১৯৮০-৮১ সালে, তৃতীয়টি ২০০৬-৭ সালে, আর এখন চতুর্থটি ২০১৪ সাল থেকে শুরু হয়ে ২০২২-২৩ এ চরম রূপ নিতে যাচ্ছে। বুর্জোয়া শ্রেণি জাতীয় স্বার্থে নিজস্ব উদ্যোগে ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন শক্তির চাপে-পরামর্শে সমস্যা একভাবে ফয়সালা করে কিন্তু সমস্যার মূল উৎপাটিত করতে পারে না। কখনও পোশাক বদল করে, কখনও খুন-খারাবি, হানাহানি-মারামারি, সংঘাত-সংঘর্ষ করে, কখনও অনুপাতে ভাগ বাটোয়ারা নিষ্পত্তি করে তারা সমাধান খোঁজে। এ সকল বড় সংকটে বুর্জোয়াদের কোন একটা গোষ্ঠী হয়তো ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিন্তু গোটা বুর্জোয়া শ্রেণি লাভবান হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় জনসাধারণ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বুর্জোয়া শাসন সংকট উভয় ক্ষেত্রেই পরিণতি ফল এক। আখেরে বুর্জোয়াদের পকেট স্ফীতি, শ্রমজীবীদের দুর্গতি বৃদ্ধি। আন্তর্জাতিকভাবে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী বিশ্বেরও একই দশা। তারা পররাজ্য গ্রাস, সম্পদ লুণ্ঠন, বাজার দখল, পুঁজির বিস্তার, যুদ্ধোন্মাদনা, যুদ্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে সংকট নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করে। বিশ্ব মন্দা সৃষ্টি মহাসংকটে পড়ে তারা দু দুটো বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়েছে। এখন বিভিন্ন আঞ্চলিক যুদ্ধকে সামনে রেখে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বাজাচ্ছে। কিন্তু বিগত দুই বিশ্বযুদ্ধে, করোনার মতো মহামারিতে, দুর্ভিক্ষে কোটি কোটি মানুষ মরেছে, কিন্তু ৩০০ কোটি মানুষের সম্পদের পরিমাণ সম্পদ ৩০ জনের হাতে জমা হয়েছে। উৎপাদন বেড়েছে, কৃৎকৌশলের উন্নতি হয়েছে কিন্তু পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বৈষম্য। সাধারণ মানুষ ভাবছেন, তাহলে উপায় কী? উপায় দেখিয়েছিল রুশ বিপ্লব। মানবজাতিকে এগিয়ে দিয়েছিল এক ধাপ সামনে। আদর্শগত চর্চায় ভুল আর ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন না থাকলেও সেটা মানবমুক্তির বিশাল নিশানা রেখে গেছে। সংকট সমাধান করতে হলে সে পথেই দুনিয়াকে এগোতে হবে।

আমাদের দেশেও পুঁজিবাদ সৃষ্ট বুর্জোয়া শাসন কবলিত মহাসংকটের হাত থেকে বাঁচার উপায় শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে জনগণের হাতে শাসন ক্ষমতা নিয়ে আসা। এখনই তা সম্ভব না হলেও গণআন্দোলনের শক্তিশালী ধারা রচনা করা ও ভবিষ্যৎ গতিমুখ সেদিক রাখা এই মুহূর্তের প্রধান কাজ। বাসদ সে লক্ষ্যে সীমিত শক্তি সামর্থ্য নিয়েই এগুচ্ছে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে, দলীয় যৌথতার বন্ধনে ইতিহাসের পাঠ নিয়ে। শ্রমজীবী জনগণের সুপ্ত শক্তি ও জাগ্রত চেতনাই আমাদের প্রধান ভরসা। ফলে রাজনীতির এই জটিল সময়ে দর্শক হয়ে থাকা নয় আসুন সক্রিয় ভূমিকা পালন করি। শোষণের সমাজ আর দুঃশাসনের ব্যবস্থা উৎপাটনের সংগ্রাম শক্তিশালী করি। বাসদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আহবান জানাই–

আসুন ব্যবস্থা বদলের মাধ্যমে অবস্থা বদলের আন্দোলনে যুক্ত হই এবং সংগ্রামটাকে এগিয়ে নেই।

রিজার্ভ সংকট এবং আইএমএফের ঋণ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেওয়ার বিষয়ে সরকারের পরিকল্পনা কী? এ বছরের বাজেটে ৮২ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকা ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দ আছে। ভর্তুকির বেশির ভাগ টাকাই ব্যবহৃত হবে জ্বালানি তেল-গ্যাস, বিদ্যুৎ ও সারের জন্য। আইএমএফ অবশ্য ভর্তুকি কথাটি বলতে চায় না। ভর্তুকিকে 'ভর্তুকি ব্যবস্থাপনা' বলে থাকে তারা। ভর্তুকি ব্যবস্থাপনায় নগদ ঋণ নামে খাতের উল্লেখ করা হয়, আসলে শেষ বিচারে এটা ভর্তুকিই। এ ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি), বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) ইত্যাদি সংস্থাকে। ধরে নেওয়া হয় এগুলো অফেরতযোগ্য ঋণ এবং বিপিসি ও পিডিবি সরকারকে তা ফেরত দেয় না, সরকারও ফেরত চায় না। বেসরকারি খাত থেকে বেশি দামে বিদ্যুৎ কিনে কম দামে বিক্রি করার জন্য পিডিবিকে ঋণ দেয় সরকার। এগুলো নামে ঋণ কিন্তু বাস্তবে ভর্তুকি। কারণ, সরকার এই টাকা ফেরত পায় না। জনগণের ট্যাক্সের টাকা চলে যায় সরকারের হাত হয়ে ব্যবসায়ীদের পকেটে।

গত অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত ১০টি প্রতিষ্ঠানের লোকসান পাঁচ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। পিডিবির পাশাপাশি লোকসানি অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি), বাংলাদেশ খাদ্য ও চিনিশিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি), বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা (বিসিআইসি), বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা (বিআরটিসি), বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশন (বিজেএমসি), বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন (বিটিএমসি), বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন করপোরেশন (বিআইডবিউটিসি), বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডবিউটিএ) বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন (বিএফডিসি)।

সংস্থাগুলো বছরের পর বছর লোকসান দিয়ে যাচ্ছে আর তা মেটানো হচ্ছে জনগণের করের টাকায়। আইএমএফ বলেছে, এ লোকসান কমিয়ে আনার কৌশল নির্ধারণ করতে হবে এবং ধীরে ধীরে এদের কয়েকটিকে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দিতে হবে। যে দুর্নীতির ফলে লোকসান হচ্ছে তার বিরুদ্ধে কথা নেই, কিন্তু বেসরকারিকরণের নামে লুটপাট ও শোষণকে সুযোগ করে দেওয়াই যেন মূল উদ্দেশ্য।

চলতি অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ১ লাখ ১৩ হাজার ৫৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার কথা বলা আছে। এ বরাদ্দ থেকেই রয়েছে স্বাস্থ্য খাত ও শিক্ষা খাতের অংশ। আইএমএফ অর্থ বিভাগকে বলেছে, এ দুই খাতের ব্যয়গুলো যথাযথ করতে ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করা এবং প্রকৃত উপকারভোগী যেন সহায়তা পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে।

ভর্তুকি কমিয়ে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির পর মূল্যস্ফীতি বেড়ে গেছে এবং বিদ্যুতের দাম বাড়ালে কি তা আরও বেড়ে যেত না–এই প্রশ্নের জবাবে আইএমএফের প্রস্তাবের পক্ষে অনেকে বলছেন, 'এখন যে সরকার খরচ মেটাতে পারছে না, তার চেয়ে মূল্যবৃদ্ধি ভালো। দুটি বিকল্প আছে, 'বিদ্যুৎ চাই না, নাকি বেশি দামে চাই'। তাদের ধারণা অনেকেই বলবেন যে, বেশি দামে হলেও বিদ্যুৎ চাই। তার অর্থ জনগণকে বেশি দামে বিদ্যুৎ কিনতে হবে। সারের ভর্তুকি কমানোর পক্ষে যুক্তি করতে গিয়ে কেউ কেউ বলছেন, 'রাসায়নিক সার এত সস্তা না হলে জৈব সারের একটা বড় বাজার তৈরি হতো। ভর্তুকি কমিয়ে আমাদের সে পথে যেতে হবে।' বাস্তবে এর ফলে কৃষি, কৃষক ও ভোক্তা কী সমস্যায় পড়বে সে বিষয়ে কোনো ভাবনা নেই।

লোকসানি সংস্থাগুলো প্রসঙ্গে সাধারণ যুক্তি হচ্ছে, বোঝাগুলো ঘাড় থেকে নামানো দরকার। পরিচালনা পর্ষদে সরকারি কিছু লোক বসে সুবিধা ভোগ করেন। এ ছাড়া এগুলোর কোনো দরকারই নেই। সাধারণভাবে এ কথা শুনতে ভালো এবং এটা তো চোখেই দেখছেন সবাই। কিন্তু এর ভেতরের কারণ কী? কেন লোকসান হয়, কোন নীতি অনুসরণ করার কারণে লোকসান হয় আর সংস্থাগুলো লোকসান করলেও কর্তাব্যক্তিদের সম্পদ বাড়ে কেন, লোকসানি সংস্থা বিক্রি করলে কারা কেনেন সেসব, তাদের পরিচয় কী আর তারা কেনার পর কী করেন? এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করলে দেখা যাবে একটা চক্রাকার কাজ চলছে। জনগণের সম্পদকে লোকসানি বানাও, সেসব বিক্রির মতামত তৈরি করো, ভাগ্যবান ক্রেতা নির্ধারণ করো, রাষ্ট্রীয় সম্পদ কেনার জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ দাও, ঋণের টাকা শোধ না করেও তারা দাপটের সঙ্গে চলতে পারবেন এমন ব্যবস্থা করে দাও, এ ধরনের চক্রে আবর্তিত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বেচাকেনার কাজ। দেশের ঘাড় থেকে লোকসানের বোঝা নামানোর নামে নতুন করে খেলাপি ঋণের বোঝা কাঁধে নিচ্ছে দেশ।

দেশে দীর্ঘদিন ধরে ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে কথা বলা হলেও সরকার তাতে কান দেয়নি কখনো। জুন শেষে ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ সোয়া লাখ কোটি টাকা, যা বিতরণ করা মোট ঋণের প্রায় ৯ শতাংশ। আইএমএফ এই হার ৩ শতাংশে নামিয়ে আনার পরামর্শ দিয়েছে। ঋণের শর্ত হিসেবে নতুন করে এ বিষয়টি জোরালোভাবে উপস্থাপন করেছে আইএমএফ। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টিও বেশ জোরেশোরে তুলে ধরা হয়েছে বলে জানা গেছে।

সূত্র জানায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে বৈঠকে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে রিজার্ভের প্রকৃত হিসাব নিয়ে। ভুল শ্রেণিকরণের কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভের আকার বড় হয়েছে বলে দাবি করে আইএমএফ। ২০২১ সালে আইএমএফ বলেছিল, চলতি বছরের জুনের শেষ দিকে বাংলাদেশে ৪৬ বিলিয়ন ডলারের রিজার্ভ থাকার যে কথা বলা হয়েছিল, তা আসলে ১৫ শতাংশ বাড়িয়ে বলা হয়েছে। রিজার্ভ বহির্ভূত সম্পদ অন্তর্ভুক্ত করে রিজার্ভ ৭ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার বাড়িয়ে বলেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এবার ঋণ নিয়ে আলোচনা করতে এসে আইএমএফ

এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

ভাত ও ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম গড়ে তুলুন

বাম জোটের গণপদযাত্রা অনুষ্ঠিত

সরকারের পদত্যাগ, সংসদ ভেঙে দেয়া, নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন, নিত্যপণ্যের দাম কমানো, গ্রাম-শহরে রেশনিং চালু, দুর্নীতি দুঃশাসনের অবসান ও বাম গণতান্ত্রিক বিকল্প গড়ে তুলতে বাম গণতান্ত্রিক জোটের আহ্বানে দেশব্যাপী গণপদযাত্রা কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২২ অক্টোবর ঢাকার পুরানা পল্টন মোড়ে জমায়েত হয়ে প্রেসক্লাব-শাহবাগ, এ্যালিফেন্ট রোড, সাইন্স ল্যাবরেটরি হয়ে নীলক্ষেত পর্যন্ত গণপদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

পদযাত্রা শেষে নিউমার্কেট-নীলক্ষেত মোড়ে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জোটের সমন্বয়ক, সিপিবির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স। বক্তব্য রাখেন বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশিদ ফিরোজ, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, বাসদ (মার্কসবাদী) সমন্বয়ক মাসুদ রানা, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম সবুজ ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ভাত ও ভোটের অধিকার দিতে ব্যর্থ এই সরকার স্বৈরাচারী কায়দায় দুঃশাসন চালাচ্ছে। সভা-সমাবেশে বাধা দিয়ে, জনগণের কণ্ঠরোধ করে ক্ষমতার মসনদ স্থায়ী করতে চায়। সরকারের ফ্যাসিবাদী আচরণ, সারাদেশে ভয়ের রাজত্ব কায়েম করেছে। দেশের মানুষ নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির সংকটে জর্জরিত। আধা পেট খেয়ে থাকছেন অনেকে। কিন্তু দুর্নীতি, লুটেরাদের দাপট কমছে না। বিদেশে পাচারের টাকা ফেরত আনা হচ্ছে না। খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়েই চলেছে।

নেতৃবৃন্দ মজুরি অবিলম্বে কমিশন গঠন ও জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ২০ হাজার টাকা ঘোষণার দাবি জানিয়ে বলেন, পাচারকৃত টাকা ফেরত আনলে, খেলাপি ঋণ উদ্ধার করলে এর জন্য টাকার অভাব হবে না। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে কার্যকর কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না উপরন্তু কালোটাকা সাদা করার অনৈতিক পথে হাটছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, জনগণকে দুর্ভিক্ষের ভয় দেখানো হচ্ছে। আর সরকার আগাম এ কথা থেকে লুটেরারা লুটপাটের আরও সুযোগ নেবে। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি মন্ত্রীদের আগাম বার্তার সুযোগ নেয় ব্যবসায়ীরা। দেশে পণ্যের অভাব নেই; আছে সরকারের তদারকির অভাব। দেশের কৃষক উৎপাদন বাড়াতে প্রস্তুত তাদের সহায়তা দিন। আর উৎপাদিত ও নিত্যপণ্যের ন্যায্যমূল্য ও সুষম বণ্টন নিশ্চিত করুন। তাহলে সংকট দূর হয়ে যাবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বর্তমান সরকারের উচ্ছেদ ও শোষণমূলক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের পরিবর্তন করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ছাড়া সংকট উত্তরণের পথ নেই। এজন্য নীতিনিষ্ঠ বাম গণতান্ত্রিক শক্তির পতাকাতলে সমবেত হয়ে গণআন্দোলন গণসংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

সার, ডিজেলের দাম কমানো ও রেশনিং এর দাবিতে কৃষক ফ্রন্টের স্মারকলিপি পেশ

সার, ডিজেলের দাম কমানো, ভেজাল সার-কীটনাশক ও বন্ধ্যা বীজ সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং খেতমজুরদের জন্য গ্রামীণ রেশনিং চালু করার দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট সোনারগাঁ উপজেলা শাখার উদ্যোগে ১৬ অক্টোবর ইউএনও-এর মাধ্যমে কৃষিমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করেন সংগঠনের উপজেলা সভাপতি বেলায়েত হোসেন, সদস্য আনোয়ার হোসেন, রুবেল প্রমুখ।

স্মারকলিপি পেশের আগে এক সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, করোনাকালীন সময় দেশের কৃষক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রেখে দেশের মানুষের মুখে আহার যুগিয়েছে। অথচ কৃষি ও কৃষক বরাবরই অবহেলিত হচ্ছে। কৃষি খাতে বরাদ্দ যেমন কমেছে তেমন সার, বীজ, কীটনাশকসহ কৃষি উপকরণের দাম বেড়েই চলেছে। অন্যদিকে কৃষক কৃষি ফসলের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে না। এর মাঝে ইউরিয়া সারের দাম বাড়ায় বিঘাপ্রতি ১২০০ টাকার বেশি উৎপাদন খরচ বেড়েছে। ডিজেলের দাম বাড়ায়ও উৎপাদন খরচ বেড়েছে। বিদ্যুতের ভয়াবহ লোডশেডিং-এ কৃষি উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে। এর মধ্যে আবার বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর পাঁয়তারা করা হচ্ছে। ভেজালসার, বীজ-কীটনাশকে বাজার সয়লাব হয়ে আছে। ভিজিএফ, ভিজিডি, কর্মসৃজন প্রকল্পসহ বিভিন্ন গ্রামীণ প্রকল্পে ব্যাপক দলীয়করণ ও দুর্নীতি রয়েছে। ক্ষেতমজুরদের বছরে ৮ মাস কাজ থাকে না। ফলে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষদের বাঁচানোর দাবিতে রেশনিং চালু করা প্রয়োজন। একদিকে ব্যাংকগুলো থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা ধনীরা লোপাট করেছে। সরকার এর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে পারছে না। আরেকদিকে বন্যা-খরায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে মাত্র ১০ হাজার টাকা পরিশোধ করতে না পারায় বহু কৃষক কারাগারে বা ফেরারি আসামি বা আত্মহত্যা করছে। আমরা ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মওকুফের আহ্বান জানাই। এছাড়া শস্যবিমা চালু, নদী-খাল-জলাধার দখল-দূষণ বন্ধ করাসহ দেশ ও জনগণের স্বার্থে বন্ধকৃত পাটকল চালু করা প্রয়োজন। স্মারকলিপিতে এসব বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে কৃষিমন্ত্রীর নিকট আহ্বান জানানো হয়।

উল্লিখত দাবিতে দেশের বিভিন্ন জেলায় ডিসির মাধ্যমে কৃষিমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

সার, ডিজেলের দাম কমানো, ভেজাল সার-কীটনাশক ও বন্ধা বীজ সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং খেতমজুরদের জন্য গ্রামীণ রেশনিং চালু বন্ধকৃত পাটকল চালু করাসহ কৃষক ফ্রন্টের উত্থাপিত দাবিতে বগুড়া জেলা শাখার মিছিল ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি পালিত।

নারায়ণগঞ্জে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের দাবিতে সমাবেশ

শিক্ষা বাণিজ্য বন্ধ ও শিক্ষাক্রম ২০২০ বাতিলের দাবি

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ, শিক্ষাক্রম ২০২০ বাতিল ও নারায়ণগঞ্জে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করার দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে ২০ অক্টোবর জেলার কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলা কমিটির সভাপতি মুন্নি সরদারের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহম্মেদ রাতুলের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন ছাত্র নেতা নাছিমা সরদার ও তামান্না বিনতে কথা প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, 'টাকা যার শিক্ষা তার' এই নীতির ভিত্তিতে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। নারায়ণগঞ্জ দেশের একটি পুরানো জেলা। এখানে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে। কিন্তু স্বাধীনতার ৫১ বছরেও কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এই জেলায় প্রতিষ্ঠা হয়নি। ফলে অনেক শিক্ষার্থী অন্যান্য জেলায় শিক্ষা গ্রহণ করতে যায়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২০ সরকার প্রণয়ন করছে যেখানে বিজ্ঞান শিক্ষার পরিসর কমিয়ে আনার প্রস্তাব করা হয়েছে। এর বদলে সেখানে যুক্ত করা হচ্ছে ক্যারিয়ার শিক্ষা, জীবন ও জীবিকা এরকম নতুন কিছু বিষয়। ফলে বইয়ের বোঝা বাড়লেও জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। অল্প বিজ্ঞান পড়ে মাধ্যমিক শেষ করে উচ্চ মাধ্যমিকে গিয়ে হঠাৎ বিজ্ঞান বিভাগের পরিসর বেড়ে গেলে শিক্ষার্থীরা চাপের মুখে পড়বে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার শিক্ষা খাতকে ব্যবসায়ীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। ধীরে ধীরে সরকারি সকল সেবা খাত ব্যবসায়ীদের জন্য উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। এতে জনগণ অসহায় হয়ে পড়েছে। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ করা ও স্বাস্থ্য খাতের উন্নতি এবং শিক্ষাক্রম ২০২০ বাতিল ও নারায়ণগঞ্জে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করার জোর দাবি জানান।

কর্নেল তাহের : সমাজ বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর এক লড়াকু জীবন

১২ পৃষ্ঠার পর

প্রাণঘাতি বিদ্রোহে নামলো, আনছারদের কেন বিদ্রোহ করতে হচ্ছে? তাদেরকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। কর্নেল তাহের বলেছিলেন, জনগণের মুক্তির লড়াইতে অংশগ্রহণকারী বাহিনীকে জনগণের বাহিনী না করে শাসক-শোষকদের বাহিনীতে রূপান্তরিত করলে তার অনাকাঙ্ক্ষিত ফলাফল ভোগ না করে উপায় নাই। পাকিস্তানিরা যেমন জনগণের উপর নিপীড়ন চালানো ও শোষণ ব্যবস্থা বহাল রাখার জন্য সশস্ত্র সামরিক শক্তিসমূহকে ব্যবহার করেছিলো, আজকে স্বাধীন বাংলাদেশে এসেও আমরা সেই চিত্র কতটা পরিবর্তন করতে পেরেছি? কর্নেল তাহেরকে স্মরণ করা এবং তার জীবন থেকে শিক্ষা ও সংগ্রামকে সামনে রেখে আজকে আবার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা দরকার। সেই উদ্যোগ সব জায়গা থেকে আসা দরকার। এই আহ্বান রেখে আমি আবারও কর্নেল তাহেরের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে এবং শিক্ষা নিয়ে আমাদের আগামী দিনের বাংলাদেশের যে বিপ্লব, তাকে সফল করার সংগ্রামে আহ্বান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

কর্নেল তাহের লাল সালাম। জয় সমাজতন্ত্র।

বিপ্লবের জন্য উৎপাদন পদ্ধতি ও রাষ্ট্র চরিত্র নির্ণয় এবং সঠিক রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণ জরুরি

১১ পৃষ্ঠার পর

হয়েছে। অনেকগুলো কলকারখানা এখানে তৈরি হয়েছে। স্বাধীনতার পর আমাদের ৮০টা রাষ্ট্রীয় পাটকল ছিল। এখন সবগুলো বন্ধ করে দিয়েছে। রাষ্ট্রীয়গুলো বন্ধ হয়ে যাওয়া দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ২০০-২৫০টি ব্যাক্তিমালিকানাধীন পাটকল নতুন তৈরি হয়েছে সেটা অনেকে দেখতে পাচ্ছে না। পাট পণ্য রপ্তানি হচ্ছে, পাটের রপ্তানি আয় বাড়ছে। তার মানে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ব্যাক্তিমালিকানাধীন শিল্প সম্প্রসারিত হচ্ছে। এভাবে প্রত্যেক সেক্টরেই হচ্ছে। গার্মেন্টস এরও একটা প্রসার ঘটেছে। দেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় ভারী শিল্প চট্টগ্রাম স্টীল মিল বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু বেসরকারি BSRM, KSRM-সহ অনেক স্টিল কারখানা গড়ে উঠেছে। জাহাজ ভাঙা এবং জাহাজ প্রস্তুত কারখানা তৈরি হয়েছে বেসরকারি খাতে। শিল্প, শিল্পের রূপ, শিল্পের চরিত্র সম্পর্কে আগে যে সংজ্ঞা ছিল এখন সেটা নাই। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিল্পের বিকাশ অর্থাৎ কৃষি, শিল্প অর্থনীতিতে পুঁজির বিকাশ কতখানি হচ্ছে সেটা নিয়ে আরও বিস্তারিত ও গভীর আলোচনা করা দরকার।

আমাদের দেশে কৃষি নিয়ে সবচেয়ে বেশি বিতর্ক ছিল। বর্গা প্রথা, ইজারা প্রথা থেকে শুরু করে এসকল বৈশিষ্ট্য ছিল বলে কৃষিতে সামন্তবাদ আছে এটা বলা হতো। কারণ এগুলো সামন্তসমাজের বৈশিষ্ট্য। আমাদের দলের প্রতিষ্ঠা সময় থেকে আমরা বলে এসেছি এগুলো কৃষির চরিত্র নির্ণয়ে প্রধান বিষয় হতে পারে না। প্রধান বিষয় হলো উৎপাদন কি উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে, উৎপাদনের লক্ষ্য কি এবং তার গতিমুখ কোনদিকে সেটা দিয়েই কৃষির চরিত্র নিরূপণ করতে হবে। এখন বর্গাপ্রথা আগের মতো বাধ্যতামূলক চিরায়ত নেই, এটা এখন চুক্তিভিত্তিক পর্যায়ে চলে এসেছে। এখন কৃষক জমির মালিকের সাথে দেনদরবার করে, কে কত বিনিয়োগ করবে, ফসল কে কত অংশ পাবে এর ভিত্তিতে জমি বর্গা নেয়। যদি বর্গাচাষির লাভের সম্ভাবনা থাকে সে জমি চাষ করে না হয় করে না। চুক্তিভিত্তিক বর্গা সামন্তীয় বৈশিষ্ট্য নয়। এখন উল্টো বর্গা প্রথাও চালু হয়েছে। বর্গা চাষ এখন লিজ সিস্টেম হয়ে গিয়েছে। তারা কন্ট্রাক্টে দিয়ে দেয়। এক বছর চাষ করলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিতে হবে। হাট ইজারাও আগের মত নাই। ডিসিরা এখন বড় বড় হাট ইজারা দেয়। এগুলো সামন্তীয় বৈশিষ্ট্য নয়। এগুলো রাষ্ট্রীয় আয়োজনে ও নিয়ন্ত্রণে ইজারা দেয়া হচ্ছে। প্রশাসনের উদ্যোগেই রাজস্ব আয়ের উপায় হিসেবে এই ইজারা ব্যবস্থা আছে। আরেকটা কথাও তারা বলছে, কৃষি মজুর মাসভিত্তিক, বছরভিত্তিক প্রথাগত ধারার মাধ্যমে কাজ করে। আমরা বলছি, এখন আর এরকম ব্যবস্থা চালু নেই। অনেক ক্ষেত্রে বর্গা চাষীরা বর্গা চাষ করতে চাচ্ছে না, জমি পড়ে থাকছে। সামন্তবাদে বর্গা চাষীরা বর্গা চাষ করতে বাধ্য ছিল। বাধ্য শ্রম আর নাই। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, সামন্তবাদে উৎপাদন হয় ভোগের জন্য আর পুঁজিবাদে উৎপাদন হয় মুনাফার জন্য। বলা হয় কৃষকরা যে চাল উৎপাদন করে তার বেশিরভাগ সে ভোগ করে। তাহলে যে চাল উৎপাদিত হয় সেটা যদি ভোগে যায়, এটাতো পুঁজিবাদের লক্ষণ না। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, চালটা জাতীয় বাজারের পণ্য কিনা? এই চাল দ্রব্য হিসেবে ভোগও করতে পারে আবার বিক্রি করতে পারে পণ্য হিসেবে। চাল বাংলাদেশের যে কোন বাজারে বিক্রি করা যায় কিন্তু সামন্তবাদী ব্যবস্থায় ইচ্ছা করলে যে কোন বাজারে সেটা বিক্রি করতে পারে না এবং তা জাতীয় বাজারের পণ্য হয় না। তাছাড়া এখন বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন হচ্ছে মূলত মুনাফার উদ্দেশ্যে। প্রমান রাতারাতি ধানচাষের জমিতে ভুট্টা চাষ, পাহাড়ে জুম চাষের জমিতে তামাক চাষ ইত্যাদি। একটা সমাজ থেকে আর একটা সমাজে সম্পূর্ণ পরিবর্তন তো রাতারাতি হয়ে যায় না। তার কিছু অবশেষ থাকে। সেটা বস্তুগত ক্ষেত্রেও যেমন থাকে আবার ভাবগত ক্ষেত্রে, মানুষের সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, রুচি, অভ্যাসের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে পূর্বের সমাজের রেশ থেকে যায়। এটা প্রতিনিয়ত সাংস্কৃতিক সংগ্রাম ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে সঠিক বিচার বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করলে দেখা যাবে সকল খাতেই উৎপাদন এর চরিত্র পুঁজিবাদী।

রাষ্ট্র চরিত্র নির্ধারণে পুঁজির নির্ভরতার প্রশ্নও এসেছে। আগে বাংলাদেশের কথিত উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা পরিচালিত বাংলাদেশের উন্নয়ন ফোরাম (বিডিএফ)-এর বৈঠক হতো প্যারিসে। বাংলাদেশের উন্নয়নের কৌশল, পরিকল্পনা, অর্থায়ন নিয়ে আলাপ-আলোচনা হতো প্যারিস কনসোর্টিয়ামে। বাজেটের আগে অর্থমন্ত্রীরা সেখানে গিয়ে বসে থাকতো, টাকার জন্য। '৮০-র দশকে অবস্থা যে রকম ছিল এখন আর অবস্থা আগের মতো নেই। আমরা বলেছিলাম বুর্জোয়ারা যদি বিদেশের ওপর নির্ভরশীল হয়ও এই নির্ভরতার দুইটা দিক আছে। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের পুঁজি খাটাতে চায়, কিন্তু খাটাতে পারছে না, তারা বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের মাধ্যমে সে পুঁজি খাটায়। বাজার ধরে রাখতে ও বিস্তৃত করতে তৎপর থাকে, এটা বুর্জোয়ারা জেনেই সেখানে যায়। আবার বুর্জোয়ারা নির্ভরতা কমিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করে এবং নিজ দেশের বুর্জোয়াকে শক্তিশালী করে। আমাদের দেশের বুর্জোয়ারা এখন আগের মতো সাম্রাজ্যবাদীদের উপর অতবেশি নির্ভর করে না। এ বুর্জোয়ারা দিনে দিনে এখন অনেক আত্মনির্ভরমুখী। যদিও এ যুগে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার বাইরে কোন পুঁজিবাদই টিকে থাকতে পারে না। এখানে দরকষাকষি যেমন থাকে তেমনি অসম লেনদেনের গাঁটছড়াও থাকে। বিপ্লব পূর্ব রাশিয়ার মতো বাংলাদেশেও বিতর্ক আছে, এখানে কোন শ্রেণি বিপ্লব করবে? বাংলাদেশে কী শক্তিশালী পুঁজিবাদ আছে?। এখানে শিল্পের বিকাশ হয় নাই, শ্রমিক শ্রেণিও বিকশিত হয় নাই। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্বদানকারী মূল শক্তি যেহেতু বিকাশমান শ্রমিক শ্রেণি সেহেতু এখানে কী ধরনের বিপ্লব হবে। এখানে যেটা দেখা দরকার, সমাজে শ্রমিকরা সংখ্যায় কত, কৃষকরা কত? এখন সমাজে অগ্রসরমান শ্রেণি কোনটা? শ্রমিক, কৃষক নাকি পেটি বুর্জোয়া? সে জায়গায় এসে সামাজিক আন্দোলন, রাজনৈতিক আন্দোলন, অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন সমস্ত জায়গায় শ্রমিকশ্রেণিই সামনে চলে এসেছে।

গত ১৪ বছর ধরে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থেকে শ্রমজীবী-মেহনতি সাধারণ জনগণের স্বার্থ ক্ষুন্ন করে ধনিক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার জন্য যা যা করণীয় তাই করছে। পুঁজিবাদ মানে মুনাফা। তাই মুনাফার স্বার্থে যা যা করা দরকার তাই করবে। স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের রাষ্ট্র ক্ষমতায় যে সরকারই এসেছে তারা সম্ভাব্য সকল উপায়ে এখানকার ধনিক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থেকে শাসন প্রশাসনে সকল জায়গায় অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরি করেছে। জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে গিয়ে দেশে পরিচালনা করছে। সংবিধানে অনেক ভালো ভালো কথা লেখা থাকলেও সেগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক কালো আইন, রাষ্ট্রধর্মসহ অনেক বিষয় নিয়েই তারা দেশ পরিচালনা করছে। যখন নির্বাচন আসে, রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকা বা যাওয়ার বিষয় আসে তখন তারা বলছে সংবিধানের বাইরে কিছু করতে পারবে না। সংবিধান মেনে তাদের চলতে হবে। অথচ প্রতিনিয়ত তারা সংবিধান লংঘন করে দেশ চালাচ্ছে। শ্রীলঙ্কায় যে জনগণের বিক্ষোভ হলো, এত বড় আন্দোলন হল তাও শেষ পর্যন্ত চোরাগলিতে চলে গেল। রাজাপাকসে গিয়ে রণিল বিক্রমাসিংহকে এনেছে আবার দীনেশকে এনেছে। এরা সবাই রাজাপাকসে পরিবারের খুবই ঘনিষ্ঠ। রণিল আর দীনেশ আবার সহপাঠী ছিল স্কুলে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশ থেকে তাদের অভিনন্দন বার্তা দেয়া হচ্ছে। বিক্ষোভকারীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে বল প্রয়োগ করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়া হচ্ছে। বিক্ষোভ দমন করার চেষ্টা চলছে। এখানেও পুঁজিবাদী বুর্জোয়া শাসনকে আপেক্ষিক অর্থে টিকিয়ে রাখা এবং স্থায়িত্ব ধরে রাখার চেষ্টা চলছে। ভারতেও একই কাজ চলছে। হিন্দুত্ববাদকে উস্কে দিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকা ও পুঁজিবাদী শোষণ লুণ্ঠন জারি রাখার চেষ্টা চলছে। বাংলাদেশের সরকারও এ ধরণের চেষ্টা করে যাচ্ছে ফ্যাসিবাদী, স্বৈরাচারী, কর্তৃত্ববাদী শাসন পরিচালনা করে। এটা ছাড়া আজকের দিনে কোন দেশেই বুর্জোয়াদের পক্ষেই বুর্জোয়া শাসন কায়েম রাখা সম্ভব না।

আমেরিকাতেও ট্রাম্প নানাভাবে চেষ্টা করেছে ক্ষমতায় আসতে। শেখ হাসিনা সরকারও ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করতে নানা আয়োজন করছে। আলোচনা যে নির্বাচন নিয়ে সেই নির্বাচন ব্যবস্থাই তো ভঙ্গুর। নির্বাচন প্রক্রিয়ার উপর মানুষের আস্থা নাই। নির্বাচনে শুধু ভোট দিতে পারলেই হয় না, নির্বাচন সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক, অবাধ ও জনমতের প্রতিফলন হওয়ার জন্য যে ধরণের রাজনৈতিক সচেতনতা দরকার জনগণের মধ্যে সেই সচেতনতা তৈরির কোন উদ্যোগ নাই। জনগণ টাকার কাছে ভোট বিক্রি করে দেয়। সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতাও নানাভাবে কাজ করে। এগুলো সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। আমরা মনে করি এগুলো কাটানো দরকার এবং তারজন্য প্রতিনিয়ত মানুষকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা দরকার। মানুষকে রাজনীতির মধ্যে নিয়ে আসা দরকার, রাজনৈতিকভাবে সচেতন করা দরকার। মানুষকে যত অন্ধকারে রাখা যায় তত শাসন করা, শোষণ করা সহজ হয় এবং ক্ষমতাকে স্থায়িত্ব দেয়া যায়। ২০১৪ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১৫৩ সিটে নির্বাচিত হয়েছে। সরকার গঠনে দরকার ১৫১ জন। ফলে আর কোন আসনে নির্বাচন করার দরকারই পরে না। এ কারণে এটাকে সুষ্ঠু ভোট বলে না। কারণ মানুষ ভোট দিতে পারে নাই এবং ভোট দেয়ার প্রার্থীও নাই। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে না এটাতো হতে পারে না। হয় মানুষের ভোটের প্রতি বিরক্তি তৈরি হয়ে গিয়েছে নয়তো নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রতি অনাস্থা তৈরি হয়েছে। বাস্তবে এটা ছিল না কিন্তু জোর করে এটা তৈরি করা হয়েছিল। আর ২০১৮ সালে সেই প্রক্রিয়ায় করতে পারে নাই অন্য প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছে অর্থাৎ দিনের ভোট রাতে করতে হয়েছে। আমলা, প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে তারা ভোটের বাক্স রাতেই অর্ধেকের বেশি পূরণ করে রাখল। এটা শুধু সরকার পরিবর্তনের নির্বাচনে করছে এমন না, স্থানীয় নির্বাচনেও একই রকম করছে। ফলে আজ শাসকেরা একদিকে মানুষের ভোটাধিকার হরণ করেছে। অন্যদিকে মানুষের মৌলিক-গণতান্ত্রিক অধিকারও নির্বাসনে পাঠিয়েছে। বর্তমান অবস্থায় ফ্যাসিবাদি দুঃশাসনের অবসান, ভোট-ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা সাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাসদের পতাকাতলে সকল শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বাসদকে শক্তিশালী করে অপরাপর বাম-প্রগতিশীল-গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল-ব্যক্তি গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে বাম গণতান্ত্রিক বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ঘটাতে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এ সংগ্রামে বাসদের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের সর্বোচ্চ মেধা খাটিয়ে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানাই।

রিজার্ভ সংকট এবং আইএমএফের ঋণ

১৩ পৃষ্ঠার পর

কর্মকর্তারা বেশ জোরালোভাবেই এ বিষয়টি তুলে ধরে ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে এক ধরনের শর্ত হিসেবেই যুক্ত করে দিয়েছেন। ফলে এখন থেকে আইএমএফের কাছে তথ্য পাঠানোর সময় প্রকৃত রিজার্ভের তথ্য পাঠাতে হবে।

সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এক বছর আগে দেশে রিজার্ভ ছিল ৪ হাজার ৮০০ কোটি ডলারের বেশি। নানা খাতে খরচ করার পর তা এখন কমে হয়েছে ৩ হাজার ৫৮৫ কোটি (৩৫.৮৫ বিলিয়ন) ডলার। রিজার্ভ থেকে ৭ বিলিয়ন দিয়ে গঠন করা হয়েছে রপ্তানিকারকদের জন্য রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ)। আবার রিজার্ভের অর্থ দিয়ে গঠন করা হয়েছে লং টার্ম ফান্ড (এলটিএফ) ও গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড (জিটিএফ)। বাংলাদেশ বিমানকে উড়োজাহাজ কিনতে সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে রিজার্ভ থেকে ঋণ দেওয়া হয়েছে। আবার পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলের খনন কর্মসূচিতেও রিজার্ভ থেকে অর্থ দেওয়া হয়েছে। শ্রীলঙ্কাকে ২০ কোটি ডলার ঋণ দেওয়া হয়েছে। এসব খাতে সব মিলিয়ে ব্যবহৃত হয়েছে ৮ বিলিয়ন ডলার, যা খরচ হয়েছে তা বাদ দিয়েই তো রিজার্ভের প্রকৃত হিসাব করতে হবে। কারণ এসব অর্থ চাইলেই ফেরত পাওয়া যাবে না। এমনকি জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে না। এই বিবেচনায় বর্তমানে রিজার্ভ কমে হয় ২৭ বিলিয়ন ডলারের কিছু বেশি। আর চলতি নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) ১ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার আমদানি বিল পরিশোধের পর তা নেমে আসবে ২৫ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারে। সেপ্টেম্বরে প্রায় ৭ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি হয়েছে। যদি অন্য কোনো বড় ঘটনা না ঘটে তাহলে এই রিজার্ভ দিয়ে তিন মাসের কিছু বেশি সময়ের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব হবে।

আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী একটি দেশের কমপক্ষে তিন মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর সমপরিমাণ রিজার্ভ থাকতে হয়। সে বিবেচনায় বাংলাদেশ কিছুটা ঝুঁকিতে আছে। তাই ডিসেম্বরের মধ্যে আইএমএফের সাড়ে ৪ বিলিয়ন ডলার ঋণের প্রথম কিস্তির দেড় বিলিয়ন ডলার পাওয়ার জন্য এতটা মরিয়া হয়ে উঠেছে সরকার। আর সেটা বুঝতে পেরে আইএমএফের প্রতিনিধিদল মুদ্রানীতির কাঠামো পরিবর্তন করতে বলেছে। আইএমএফ পরামর্শ দিয়েছে বছরে দুবার মুদ্রানীতি ঘোষণা করার। এরপর বছরে চারবার ঘোষণা করতে বলেছে। প্রতিনিধিদলটি মুদ্রার ভাসমান বিনিময় হারের ওপর জোর দিয়েছে। প্রবাসী আয়ের ওপর আড়াই শতাংশ প্রণোদনা তুলে দিয়ে ডলারের দাম আরও বাড়ানোর পরামর্শ দেয়। এতে প্রবাসী আয় বাড়বে বলে মনে করে সংস্থাটি।

তিন বছরে সাড়ে চার বিলিয়ন ডলার ঋণ পেতে কেন এসব শর্ত মেনে নিচ্ছে আওয়ামী লীগ সরকার। কারণ কঠিন এ সময়ে আইএমএফের ঋণ পাওয়া গেলে অর্থনীতির ওপর যে চাপ সৃষ্টি হয়েছে তা সামাল দেওয়া যাবে এবং অন্যান্য সংস্থা থেকে ঋণ পাওয়া সহজ হবে। আইএমএফ যেসব কথা বলছে বা যেসব শর্ত দিচ্ছে তার কোনোটিই কিন্তু নতুন নয়। বাংলাদেশে তো বটেই পৃথিবীর যেখানেই এরা ঋণ দেয় সেখানেই এসব শর্ত আরোপ করে, খবরদারি করে, পরামর্শের নামে কর্তৃত্ব করে। দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনার ফলে অর্থনীতির যে ক্ষতি হয় তা পোষানোর নামে আবার ঋণের জালে আটকে ফেলার কৌশলে বাঁধা পড়ে যাবে কি দেশ?

MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড

● বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
● নভেম্বর ২০২২
● ২৩/২ তোপখানা রোড (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১০০০। ফোন : ০২ ৪৭১২০২৩১
● Website : www.spb.org.bd

সরকারের পদত্যাগ, নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার ও নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবি

বাম গণতান্ত্রিক জোটের মতবিনিময় সভায় নেতৃবৃন্দ

বাম গণতান্ত্রিক জোটের উদ্যোগে 'সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিসহ নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার-সুষ্ঠু নির্বাচন ও নির্দলীয় তদারকি সরকার'–শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা ১৫ অক্টোবর '২২ পুরানা পল্টনস্থ মুক্তিভবনের মৈত্রী মিলনায়তনে জোটের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক রুহিন হোসেন প্রিন্সের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন 'সুজন'-এর সম্পাদক ডক্টর বদিউল আলম মজুমদার, ঐক্য ন্যাপের কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য অ্যাডভোকেট এস এম এ সবুর, বাংলাদেশ জাসদের স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. মোশতাক হোসেন, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল–বাসদ-এর সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল কবির জাহিদ, বাসদ (মার্কসবাদী)'র সমন্বয়ক মাসুদ রানা, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম সবুজ প্রমুখ।

ডক্টর বদিউল আলম মজুমদার বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশে সকল নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত হওয়া কথা। অথচ দুঃজনক হলেও সত্য দেশে আজ কোন গণতন্ত্র নেই। জনগণের ভোটাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। দলীয় সরকারের অধীনে পরিচালিত নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু এবং অবাধ নির্বাচন করতে বার বার ব্যর্থ হয়েছে। ইভিএম প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কারচুপি করার জন্য ইভিএম একটি সহায়ক যন্ত্র। নির্বাচন কমিশন বলছে, ইভিএম দিয়ে জালিয়াতি করা যায়—এটা কেউ প্রমাণ করতে পারেনি। বাস্তবে এটা দিয়ে স্যুট-কোট, টাই পরে ভদ্রলোকেরা জালিয়াতি করতে পারেন। এটা দিয়ে জালিয়াতি করতে পারে মূলত নির্বাচন কমিশন, তাদের কর্মকর্তা, তাদের কারিগরি টিম ও নির্বাচন কেন্দ্রে বা বুথে দায়িত্বে থাকা প্রিসাইডিং কর্মকর্তারা।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যদি কেউ ফলাফল নিয়ে চ্যালেঞ্জ করেন তার বিপরীতে প্রদত্ত ভোট পরীক্ষা করার জন্য কোন ব্যবস্থা ইভিএম পদ্ধতিতে থাকে না, যার কারণে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দ্বারা ফলাফল প্রভাবিত করা খুবই সহজ হয়ে যায়।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচন কমিশনের ওপর মানুষের আস্থা নেই। সুতরাং তাদের যদি ইভিএম দেওয়া হয়, তাহলে সেটি দেশকে আরও বড় সংকটের দিকে ঠেলে দেবে।

অ্যাডভোকেট এস এম এ সবুর বলেন, সরকার যেকোনো পন্থায় ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করছে। মানুষের ভোটের অধিকার যদি নিশ্চিত করতে না পারি তাহলে মুক্তিযুদ্ধের স্বার্থকতাই তো বিফলে যাবে। জনগণের সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করতে হবে।

ডা. মোশতাক হোসেন বলেন, ২০১৪ বা ২০১৮ সালে যে নির্বাচন হয়েছে তাতে নির্বাচনের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে গেছে। '৯০-র গণঅভ্যুত্থানের পর যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয়েছিল পরে যে কথা বলে এটি বাতিল করা হলো তা গ্রহণযোগ্য নয়।

বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, ইভিএমের বড় দুর্বলতা হলো, ভোট হয় ইলেকট্রিক্যালি আর ফলাফল তৈরি হয় ম্যানুয়ালি, এতে কারসাজির সুযোগ থেকে যায়। আর বর্তমান অর্থনৈতিক মন্দা ও ডলার সংকটের সময়ে ৯ হাজার কোটি টাকা দিয়ে ইভিএম কেনা কোনোভাবেই সমুচিত হবে না।

তিনি বলেন, কোনো দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলো আপেক্ষিক সুষ্ঠু হয়েছে। আমরা বাম জোট দীর্ঘদিন ধরে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিসহ নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন করে আসছি এই দাবিতে গণআন্দোলন, গণসংগ্রাম গড়ে তুলে দাবি আদায় করতে হবে।

১০৫তম রুশ বিপ্লববার্ষিকী ও বাসদের ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত

৭ নভেম্বর নওগাঁ শহিদ মিনারে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ

৮ নভেম্বর কুড়িগ্রাম শহিদ মিনারে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাবেশের একাংশ

৯ নভেম্বর রংপুরে পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে সমাবেশ পূর্ব লাল পতাকা মিছিল

গত ৭ নভেম্বর ছিল রাশিয়ার মহান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ১০৫তম বার্ষিকী ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। ঐদিন কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন জেলা কার্যালয়ে দলীয় ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে যথাযথ মর্যাদায় দিবসটি পালনের সূচনা হয়।

চালসহ নিত্য পণ্যের দাম কমানো, গ্যাস-বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি রোধ, দুর্নীতি ও ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন উচ্ছেদ, গণতন্ত্র-ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বাম গণতান্ত্রিক বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলে পুঁজিবাদী শোষণ, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম জোরদার করার ডাক দিয়ে মাসব্যাপী দেশের বিভিন্ন স্থানে জনসভা, সমাবেশ ও লাল পতাকা মিছিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

জনসভা ও সমাবেশসমূহে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতনসহ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। ইতিমধ্যে ৭ নভেম্বর : নওগাঁ, দিনাজপুর, রাজশাহী, সিলেট ও ময়মনসিংহ; ৮ নভেম্বর : কুড়িগ্রাম, গোপালগঞ্জ, চাঁদপুর; ৯ নভেম্বর : রংপুর, ১০ নভেম্বর গাইবান্ধা, জয়পুর হাট, ১১ নভেম্বর : কামারখন্দ, মাগুরা, সাভার; ১২ নভেম্বর : ঢাকা, সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া, ফেনি; ১৩ নভেম্বর : যশোর, কুমিল্লা ও মৌলভীবাজার; জনসভা-সমাবেশ, আলোচনাসভা ও লাল পতাকা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ ছাড়া ১৫ নভেম্বর : বগুড়া; ১৮ নভেম্বর : চট্টগ্রাম, খুলনা, গজীপুর, জামালপুর, শাহজাদপুর; ১৯ নভেম্বর : ফরিদপুর, কক্সবাজার; ২০ নভেম্বর : সাতক্ষীরা; ২১ নভেম্বর : ঝিনাইদহ, ২৪ নভেম্বর : বরিশাল; ২৫ নভেম্বর : নারায়ণগঞ্জ ও হবিগঞ্জের বানিয়াচংয়ে জনসভা, সমাবেশ ও লাল পতাকা মিছিল অনুষ্ঠিত হবে।

সম্পাদক : রাজেকুজ্জামান রতন। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে প্রকাশক : বজলুর রশীদ ফিরোজ কর্তৃক ২৩/২ তোপখানা রোড (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
সোনালী প্রিন্টিং প্রেস, ১৬৭ ইনার সার্কুলার রোড (ইডেন কমপ্লেক্স), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ০২ ৪৭১২০২৩১, ফ্যাক্স : ০২ ৪৭১২০২৩১; E-mail : monthly.vanguard81@gmail.com